শুকতারা

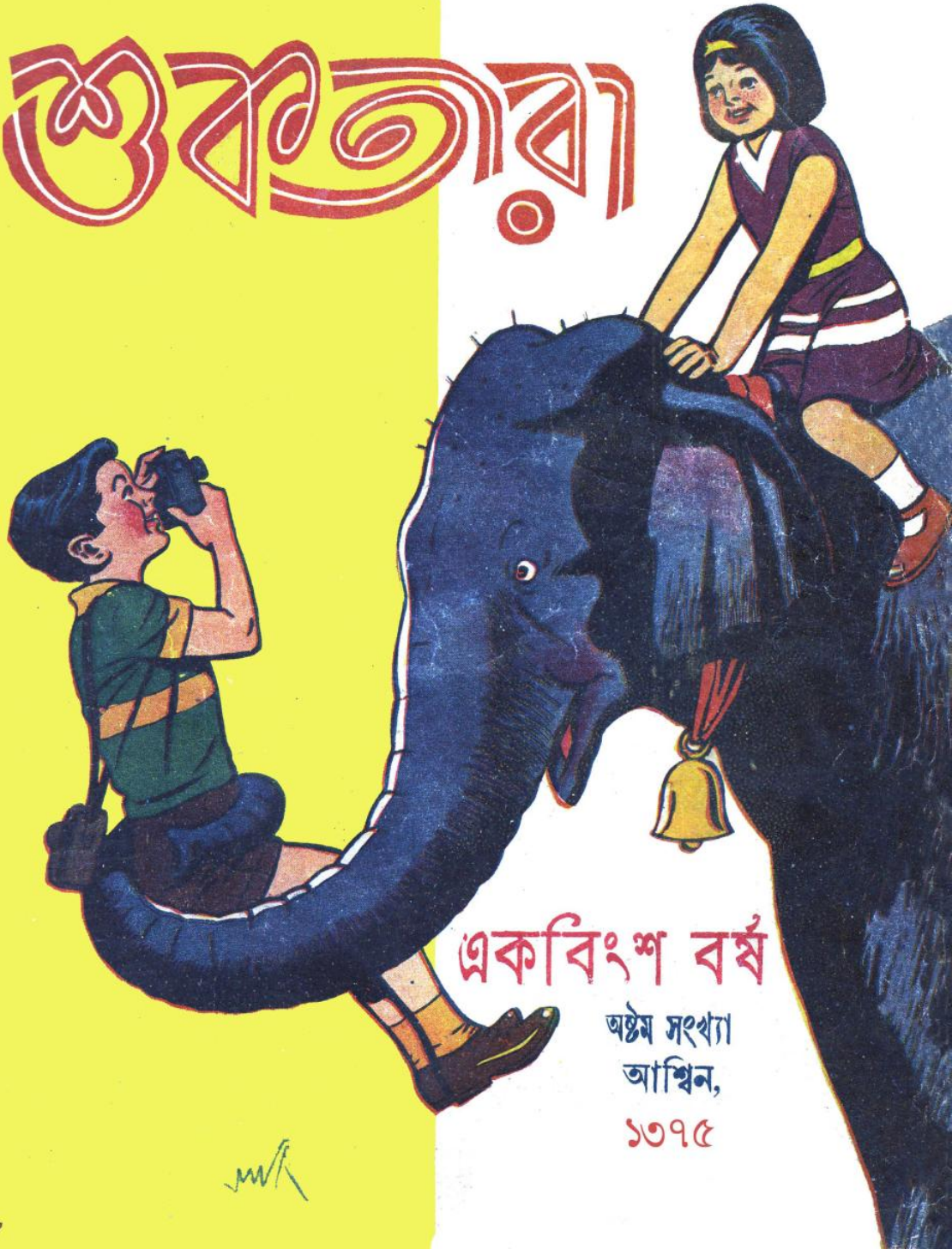

একবিংশ বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
আশ্বিন,
১৩৭৫

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

ও

সাধক মহাপুরুষদের জীবন কথা

বৈষ্ণবদের পরম আদরের ধন এই **ভক্তমাল গ্রন্থ**। ইহাতে আছে বৈষ্ণব ভক্তদের অলৌকিক কাহিনী, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের অপূর্ব লীলাপ্রসঙ্গ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসের বিশ্লেষণ, সখা ও সখীগণের পরিচিতি এবং শ্রীবৃন্দাবনধামের বিশদ বর্ণনাও ইহাতে আছে।

এই সংস্করণের বিশেষত্ব ঃ পাদটীকার দুরূহ শব্দের অর্থ, বিভিন্ন পাঠান্তর, শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক এবং পরিশিষ্টে শ্লোকসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

তাহা ছাড়াও এই বিরাট গ্রন্থে একটি নূতন অংশ যোগ করা হইয়াছে যাহা **বাংলা ভাষায় অথবা ভারতীয় কোন ভাষাতেই এপর্যন্ত হয় নাই।** বর্তমান যুগ ধর্মসমন্বয়ের যুগ—ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধক মহাপুরুষদের জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অনেক পরিশ্রমে বহু গ্রন্থ এবং বহু পত্র-পত্রিকা অনুসন্ধান করিয়া **এইরূপ একশত জীবনী তাঁহাদের প্রতিকৃতি সহ সংগ্রহ করা হইয়াছে।**

রামায়ণ মহাভারতের আকারে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ···ভক্তদের প্রতিকৃতি ছাড়াও আর্টপ্লেটে অসংখ্য রঙীন ছবি—**মূল্য মাত্র ষোল টাকা।**

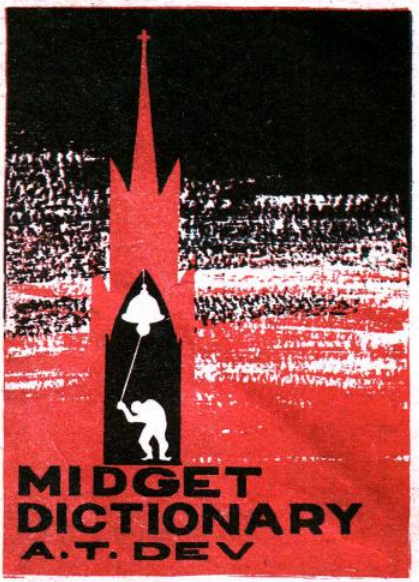

● **মিজেট মানে বামন** ●

ডিক্সনারী ও অভিধান প্রকাশক্ষেত্রে **A. T. DEV** এখনও বাংলাদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নূতন বাহির হইল **MIDGET DICTIONARY.** বইতে ২০,০০০ হাজার প্রয়োজনীয় ইংরেজী শব্দ ও বাংলা উচ্চারণ এবং তাদের সরল অর্থ দেওয়া আছে।

আকারে ছোট, অতি সহজেই পকেটে বা আপনার হাতব্যাগের এক কোণে ঠাঁই পেতে পারে। **পথে, ট্রামে, বাসে বা ট্রেনে, ক্লাবে বা আলোচনা-সভায় অক্লেশে আপনার উপকারী বন্ধু হিসেবে আপনার সাথী হতে পারে।**

দাম দু' টাকা। ২·৫০ পয়সা পাঠালে আমরা রেজেস্ট্রী বুকপোস্টে বইখানি আপনার নিকট পাঠাতে পারি।

দেব সাহিত্য কুটীর ঃঃ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

"শুকতারা"

Approved by the Text-Book Committee, Bihar, as a Supplementary Reader in Secondary and Primary Schools (Children's Monthly Journal).

(Vide Patna Gazette, 30th Dec., 1950)

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৭৫

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	বাঁটুল দি গ্রেট ...	—	প্রথম ছবি
২।	কেরানীর কেরামতি (কবিতা) ...	শ্রীনীলরতন দাশ ...	৫৪৩
৩।	আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ (আরব্য উপন্যাসের গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৫৪৫
৪।	তাজ্জব (মজার খেলা) ...	— ...	৫৫২
৫।	গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে (প্রবন্ধ) ...	ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ...	৫৫৩
৬।	ভূত ধরা (গল্প) ...	পূরবী দেবী ...	৫৫৯
৭।	বধূ (কবিতা) ...	মৌসুমী মাইতি ...	৫৬৪
৮।	ব্যাংককের থাই ভূত ! (ভ্রমণকাহিনী) ...	সবিতা ঘোষ ...	৫৬৫
৯।	একটি জামার গল্প (রূপকথা) ...	শিশির মজুমদার ...	৫৭০
১০।	মরণের বেড়াজাল (চিত্রে কাহিনী) ...	শ্রীতুষার চ্যাটার্জী ...	৫৭৮
১১।	মৃত্যুহীন টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ...	৫৮০
১২।	লণ্ডনে দেখানো আমার এক ম্যাজিক (জাদুবিদ্যা) ...	জাদুকর এ. সি. সরকার ...	৫৮৭
১৩।	রক্তদেউল (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ...	৫৯১
১৪।	ছেলেটা (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ...	৫৯৮
১৫।	সম্পাদক (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	শ্রীঅরুণ দে ...	৬০২
১৬।	"৺নমাইচন্দ্র সেন স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...	— ...	৬০৩
১৭।	হাঁদা-ভোঁদার নতুন খেলা (চিত্রে গল্প) ...	— ...	৬০৪
১৮।	বলিদান (ঐতিহাসিক গল্প) ..	দেবীপ্রসাদ সিংহ ...	৬০৬
১৯।	নতুন তথ্য (জানবার কথা) ...	শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য ...	৬০৯
২০।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	৬১১
২১।	মাঠে ময়দানে (খেলাধূলা) ...	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬১৫

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৬০ পয়সা

৺পূজার আগেই বেরুচ্ছে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের সম্পাদনায়

ছোটদের মনের মতো পূজা বার্ষিকী

আনন্দ ঃ ১৩৭৫

পাঁচখানি উপন্যাস—লিখেছেন ঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, সরোজ রায়চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

পাঁচখানি নাটক—লিখেছেন ঃ মন্মথ রায়, মণীন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, কুমারেশ ঘোষ, ধীরেন্দ্রলাল ধর।

গল্প—লিখেছেন ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জরাসন্ধ, লীলা মজুমদার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, স্বপনবুড়ো, আশাপূর্ণা দেবী, বিশু মুখোপাধ্যায়, আশা দেবী, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রলাল রায়, ইন্দিরা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রবোধকুমার সান্যাল, কুমারেশ ঘোষ এবং আরো অনেকে

কবিতা—লিখেছেন ঃ কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিতকৃষ্ণ বসু, সতীন্দ্রনাথ লাহা, শৈল চক্রবর্তী, মনোজিৎ বসু, রাধারানী দেবী, প্রভাকর মাঝি, ধীরেন বল, মায়া বসু, রবিদাস সাহারায়, হাসিরাশি দেবী, বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, ফণিভূষণ বিশ্বাস এবং আরো অনেকে।

মূল্য পাঁচ টাকা ঃ ডাকমাশুল সহ ৫·৭৫

ক্যালকাটা পাবলিশার্স ঃ ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

এবার পূজোয় শিশুদের মুখে হাসি ফোটাবে

স্বপনবুড়োর লেখা

গল্পে শিশু রবি

[বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার গল্প]

বইখানির বিশেষত্ব ঃ

- খ্যাতনামা শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি
- ঝলমলে বহুবর্ণ প্রচ্ছদপট
- প্রতিটি গল্পের আরম্ভে পূর্ণপৃষ্ঠা রঙিন ছবি
- বড় টাইপে ঝক্‌ঝকে ছাপা

মূল্য ঃ এক টাকা ত্রিশ পয়সা

পুস্তকবিক্রেতা ও নিউজ এজেন্টদের লোভনীয় কমিশন দেওয়া হয়।

আপনার চাহিদা জানিয়ে অবিলম্বে লিখুন।

—প্রাপ্তিস্থান—

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী

১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড (ক্যানিং স্ট্রীট), কলিকাতা—১

বাঁটুল দি গ্রেট

দশটা বেজে গেল, তবু তোমার ছাত্ররা এলোনা!
ঠিক আছে! আমি ওদের বিছানা থেকে তুলে আনছি!
যাতে কোন উৎপাতে না পড়তে হয়, সেই জন্যেই ল্যাসো প্র্যাকটিস করছি!
?
পড়তে যাবার সময় হয়েছে!
আরেকজন আসছে!
পড়ার শেষে
কাঁচা ঘুম থেকে আমাদের তুলে এনেছে! দ্যাখ! এর বদলা কি করে নিতে হয়!
সেদিন রাত্রে
ওঃ! বেড়ালের জ্বালায় ঘুমুতে পারছিনা!
ম্যাঁও! মিঁয়াও!
এই যাঃ! ধাক্কা লাগিয়ে বিছানার ওপর জল ফেলে দিলাম!
এই নে— হতভাগা বেড়াল! এই নে!
ঠকাস্!
বাঁটলোটার কি টিপ রে ভাইরি! অন্ধকারেই ঠিক লাগিয়ে দিলে! এবার অন্য কিছু ভাবতে হবে!
আমি ভেবেছি! এবারে চুলকুনি পাউডারের বোমা ছাড়বো!

চুলকুনি পাউডারের বোমা ওর রান্নাঘরের চিমনির ভেতর দিয়ে চালান করে দি!
গদিটা উনুনের ধারে রেখে গেলুম! তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে
খচাং!
আঁউ! আমাদের বোমা আবার আমাদের ঘাড়েই ফিরে এলো যেরে!
আর কি করা যায় বলতো? সবার ঘুম ভাঙার সময় হয়ে এলো— আর আমরা এখনো শুতেই পেলুম না!
খ্যাচ্-খ্যাচ্!
খ্যাচ্-খ্যাচ্!
মাথায় একটা যুক্তসই মতলব গজিয়েছে! আমরা বাঁটুলোকে এক কাপ স্পেশাল কফি দেবো!
বাঁটুলদা! ঘুমুতে পারছোনা বুঝি? তোমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে তোমার জন্যে এক কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে এলুম!
বাঃ! খুব লক্ষ্মী ছেলে তোরা!
হোঃ-হোঃ! আমরা কফির সঙ্গে ঘুমের অষুধ মিশিয়ে দিয়েছি!
আজ আর আমাদের পড়তে হবেনা! বাঁটুলো আজ দুপুরের আগে উঠছেনা!
ঘুম যখন ভাঙল
সর্বনাশ! বারোটা! ছেলে দুটোকে সকালে পড়ানো হলনা। যাক দুপুরেই পড়াবো!
কোচিংয়ে
বেশ! আজ তবে পড়ার বদলে ব্যায়ামের ট্রেনিং দেবো! তুই তিরিশ মিনিট কুঁকড়াসন করে থাক—আর তুই তিরিশ কিলোর বারবেল নিয়ে বৈঠক দে!
ওফ্!
উফ্!
আহ্!
আহ্!

একবিংশ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা
১৩৭৫, আশ্বিন

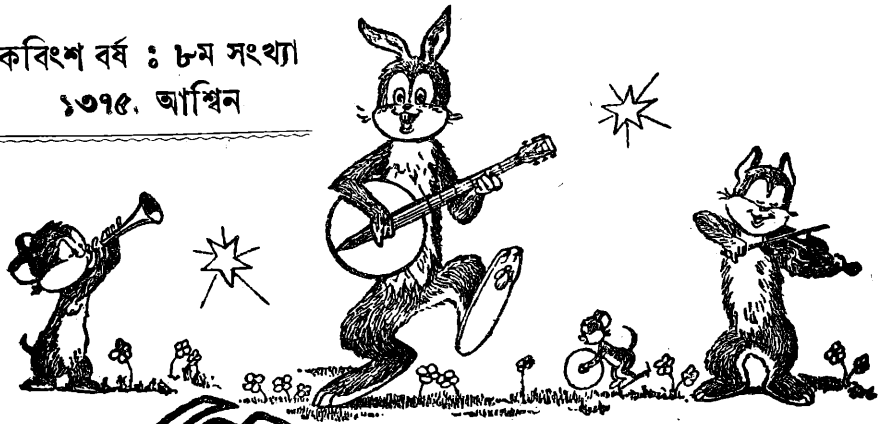

কেরানীর কেরামতি

শ্রীনীলরতন দাশ

ঊনসত্তর রেজিমেণ্টের
টমসন সেনাপতি
সৈন্য-বিভাগ হ'তে অবসর
নিয়েছেন সম্প্রতি।
পেনসন পেতে তিনি অফিসেতে
করেছেন আবেদন,
কিন্তু তাহার মঞ্জুরি পেতে
দেরি হয় অকারণ।

একদিন ঢুকে কেরানীর ঘরে
গর্জিয়া তিনি ক'ন,—
"শোন হে কেরানী! আজ যদি
আমি নাহি পাই পেনসন,
ঘুঁষি মেরে তব দাঁত ভেঙে দিব
জানিও সুনিশ্চয়।"

"কে কাহার দাঁত ভাঙে দেখা যাবে",—
কেরানীও রেগে কয়।
বড়সাহেবের কাছে অভিযোগ
টমসন করিলেন।
পরদিন বড়সাহেব ডাকিয়া
কেরানীরে কহিলেন,—
"পেনসন পেতে দেরি কেন এত
টমসন সাহেবের ?"
কেরানী কহিল,—"স্যর !
চেহারায় গরমিল আছে ঢের।
যিনি পেনসন পাবেন তাঁহার
চেহারা করি' যাচাই
কাগজপত্রে দেখি সামনের
দাঁত দুটি তার নাই।
এই লোকটির সামনের দাঁত দুটিই বিদ্যমান ;"
নথি ও পত্র দেখায় কেরানী করিতে তাহা প্রমাণ।

বড়সাহেবের মুশকিল বড় ; উপায় মিলে না হায়,
কেমন করিয়া কাগজপত্র নাকচ করা যায় !
তাঁর উপদেশে অবশেষে সেই সেনাপতি টমসন
শক্ত দুইটি দাঁত তুলে তবে পাইলেন পেনসন !

———

আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চীনদেশের এক ছেলে। বাপ তার নেই, দুঃখিনী মা-ই খেটেখুটে ছেলেটাকে খাওয়ায় পরায়। নাম তার আলাদিন।

আলাদিন? তিন বেলা যা-হোক কিছু খেতে পেলেই সে তুষ্ট, সংসারের ঝামেলায় মাথা গলাবার মতিগতি তার নেই। চোদ্দ পনেরো বৎসর বয়স তার হল, মন করলে কাজকর্ম করে দু'পয়সা আনতে না পারে, তা নয়। কিন্তু তা সে করবে না, পথে পথে ঘোরে, ইয়ার-বন্ধুর সাথে খেলাধুলো করে, আর অবসর পেলে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে বাদশাহীর স্বপন দেখে।

একটা জিনিস আলাদিনের আছে। চেহারাটা তার ভারী সুন্দর। যে দেখে, সেই তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এমনি একদিন—

রাস্তার ধারে বসে দূরের পাহাড়ের দিকে আলাদিন আনমনাভাবে তাকিয়ে আছে। সামনে দিয়ে যায় এক মধ্যবয়সী বিদেশী।

আলাদিনের দিকে তাকাতেই তার গতি মন্থর হয়ে এল। কিছুদূর গিয়ে সে ফিরে এল আবার। কাছে এসে মোলায়েম মিষ্টি সুরে বললে—"বাবা! তোমার নাম কী?"

আলাদিনও মোলায়েম করে জবাব দিল—"আলাদিন।" মোলায়েম কথাই আলাদিন সবাইকে বলে। একমাত্র কুড়েমি ছাড়া তার স্বভাবে অন্য দোষ নেই। অভদ্রতা ত নেই-ই।

"তোমার বাবার নাম ?"—আবার প্রশ্ন বিদেশীর।

"বাবা ত নেই! তাঁর নাম ছিল সামসুদ্দিন। দর্জী ছিলেন তিনি।"

"হায় হায় হায়! ভাই আমার নেই ?"—একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠল লোকটা—"হায় রে বরাত! এতদিন বাদে দেশে ফিরে এসে শুনতে হল কিনা ভাই আমার নেই!"

আলাদিন ত অবাক্! তার বাবার কোন ভাই ছিল—বড় ভাই বা ছোট ভাই—জ্ঞানগোচরে এমন কথা সে কখনও শোনে নি।

কতক্ষণ ধরে যে লোকটা ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করল! তারপর নিজেই একটু শান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"তা মা আছেন ত তোমার ?"

"আছেন বইকি! তিনি হয়ত চিনবেন আপনাকে!"

লোকটা মাথা নাড়ল—"সে আশা নেই। দাদার বিয়ের আগেই আমি আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলাম কিনা! বলতে কষ্ট হয়—দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেই আমি দেশ ছেড়ে যাই। দাদা রেগে বলেছিলেন—'তোর নাম আমি আর কক্ষণো মুখে আনব না।' কাজেই তোমার মা যদি আমার কথা কিছুই না শুনে থাকেন, তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।"

তারপর সে ঠিকানা জানতে চাইল ওদের—"আমি কাল গিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব এখন। তুমি বলবে তাঁকে আমার কথা। আমি নিশ্চয় যাব, তোমার জন্য সুন্দর সুন্দর কাপড় জামা নিয়ে যাব দেখো। আর সুন্দর সুন্দর খাবার। আমি তোমার চাচা ত দেবার অধিকার আমার আছে।"

তখুনি আলাদিনকে এক দোকানে নিয়ে গিয়ে ভরপেট মিঠাই খাইয়ে দিল লোকটা। আরও একরাশ মিঠাই কিনে দিল আলাদিনের মায়ের জন্য। তারপর ঠিকানাটা মুখস্থ করতে করতে সে সেদিনকার মত বিদায় নিল।

আলাদিন ছুটতে ছুটতে বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"মা! মা! আমার কি কোন চাচা ছিল ? বাপজানের কোন ভাই ?"

অবাক্ হয়ে মা বলল—"না ত! সে কথা কেন ?"

"না মানে ?"—আলাদিন চেঁচিয়ে উঠল—"না বললেই হবে ? জলজ্যান্ত চাচা দেখে এলাম! আমায় কত মিষ্টি খাওয়াল! তোমার জন্যও—এই নাও তোমার মিষ্টি! এর ভিতর আমারও এক ভাগ আছে কিন্তু। একবার খেয়েছি বলে আর যে আমি খেতে পারি না, এমন কী কথা ? আর বলতে গেলে আমারই ত চাচা সে! তোমার ত কেউ নয়!"

মা হেসে বলল—"এক ভাগ কেন, সবটাই তুই খাস। কিন্তু চাচা-চাচা করিস নি। তোর চাচা ছিল কেউ, এমন কথা কোনদিন শুনিনি।"

আলাদিন তর্ক করে—"কেমন করে শুনবে ? দুজনে ঝগড়া হয়েছিল কিনা! বাবা

রেগে বলেছিল চাচার নাম কক্ষণো মুখে আনবে না। আনেও নি। তুমি শুনবে কেমন করে?"

এ-তর্কের মীমাংসা হল না সে-রাতে। আর পরের দিন সকালেই চাচা সশরীরে হাজির হল। সত্যিই কত কাপড় জামা সে এনেছে! আর কত রকম খাবার! কাপড় জামা আলাদিনের আর তার মায়ের দুজনের জন্যেই।

আলাদিনের মা ভিজে গেল। লোকটা আলাদিনের চাচা না হলে কেনই বা এত খরচ করবে তার জন্য?

অচেনা লোকটা সত্যিই তখন আলাদিনের চাচা-পদে অধিষ্ঠিত হল। পরমাত্মীয়ের মত ওদের সঙ্গে বসে খানাপিনা করল, এবং খাওয়ার পরে প্রস্তাব করল আলাদিনকে সঙ্গে নিয়ে সে বাজারে যাবে ওবেলার জন্য ভাল খাবারদাবার কিনতে। তার মা আর এতে আপত্তি করবে কেন?

অতএব আলাদিন চাচার-দেওয়া নতুন পোশাকে সেজেগুজে চাচার সঙ্গে বাজার করতে বেরুল। এ বাজার? না, এ বাজারে ভাল জিনিস পাওয়া যাবে না। আর একটু দূরের বড় বাজারে গেলে—

আর একটু দূর, আর একটু দূর করতে করতে শহর ছাড়িয়ে চলে গেল চাচা। আলাদিন এই শহরেরই ছেলে হলে হবে কী, এসব ধনী মহল্লায় সে এর আগে কখনো আসে নি। বড় বড় বাড়ি, সুন্দর সুন্দর বাগিচা দেখে দেখে তার ভালই লাগছে খুব। কাজেই আপত্তি করছে না দূরে যেতে।

শহর ছাড়িয়ে ক্রমে পাহাড়ে এসে পড়ল ওরা। চাচা বলল—"বেড়াতে বেড়াতে এতটাই যখন এসে প ড়ছি, চল পাহাড়ের মাথাটা দেখে আসি। তুমি ত এ পাহাড়ে আস নি কোনদিন, কেমন?"

না, সত্যিই আলাদিন আসে নি। কে তাকে নিয়ে আসবে? আজ চাচার মুখে পাহাড় দেখার প্রস্তাব শুনে সে খুশী হয়ে রাজী হল।

পাহাড়ে উঠেও চাচা থামল না। "আরও একটু চল, আরও একটু চল" করতে করতে আলাদিনকে নিয়ে গেল পাহাড়ের অতি নিভৃত এক অংশে।

এক জায়গায় একটা উঁচু টিলা, তার মাথায় ন্যাড়া পাথর শুধু। সেইখানে গিয়ে থামল চাচা। আলাদিনকে বসতে বলে ন্যাড়া পাথরটার মাঝখানে আঁকল একটা গোল দাগ। তারপর শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালল সেই বৃত্তের ভিতর।

আগুন যখন দাউদাউ করে জ্বলছে, তখন চাচা জামার ভিতর থেকে একটা কৌটো বার করল, আর তা থেকে একরকম সাদা গুঁড়ো নিয়ে সেই আগুনের ওপর ছড়িয়ে দিতে

আগুন জ্বালল সেই বৃত্তের ভিতর। [পৃষ্ঠা ৫৪৭

লাগল। ভক্‌ভক্‌ ধোঁয়া উঠতে শুরু করল এইবার, আর সেই ধোঁয়ার ভিতর একেবারে ঢাকা পড়ে গেল আলাদিনের চাচা। ধোঁয়ার বাইরে বসে আলাদিন শুধু শুনছে বিড়বিড় করে কী-সব মন্তর আওড়াচ্ছে চাচা, তার এক বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

কিন্তু ধোঁয়া একসময় কেটে গেল, আর আলাদিন দেখে অবাক্‌ হয়ে গেল যে পাহাড়ের মাথার সেই ন্যাড়া পাথর ফেটে দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

আলাদিনের এতক্ষণ বিষম ভয় করছিল চাচার এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে। চাচা যে সোজা লোক নয়, এইরকম একটা সংশয় জেগেছে তার মনে। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু পালাতে পা-ও উঠছে না। একটা বিষম কৌতূহল তাকে বেঁধে রেখেছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এর পর কী? এর পর কী? না দেখে আলাদিন যেতে পারছে না।

এমনি সময় চাচা সস্নেহে ডাকল—"আলাদিন, এসে দেখ, এই গর্তের ভিতর কত হীরে মণি মুক্তোর ছড়াছড়ি। নেমে গেলেই তুলে আনতে পার।"

হীরে? মণি? মুক্তো? ভয়ডর ভুলে গিয়ে আলাদিন ছুটে গেল চাচার পাশে, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল পরম আগ্রহে। সত্যিই ত! আগুনের মত ঝলক দিচ্ছে কী ওসব? কোন্‌গুলো হীরে, কোন্‌গুলো বা মণি বা মুক্তো, তা অবশ্য বুঝবার শক্তি নেই তার, কিন্তু সব কয়টি গাদাই যে উঁচুদরের দামী পাথরে ভর্তি, তা তার মত বোকারও বুঝতে দেরি হল না।

কিন্তু—এ আবার কী হল?

উৎসুক হয়ে সে নীচের দিকেই তাকিয়ে আছে, এমন সময়ে তার চাচা একটা কাণ্ড

করে বসল। দুই হাতে আলাদিনকে ধরে ধপাস করে নামিয়ে দিল সেই গর্তের ভিতরে। গুহাটা এমন কিছু গভীর নয়, তাহলেও আচমকা পড়ে যাওয়ার দরুন বেশ-একটু ব্যথা তার লাগল বইকি!

ককিয়ে উঠে সে চেঁচিয়ে ডাকল—"চাচা! এ কী?"

চাচা মিষ্টি গলায় বলল উপর থেকে—"তোমার ভয় করবার কিছু নেই। দেখছ ত, নীচে থেকে কেউ যে নিজে নিজে উপরে উঠে আসবে, তার কোন উপায় নেই। আমি যদি নীচে নামতাম, তুমি আমাকে টেনে তুলতে পারতে না। অথচ তুমি নেমেছ, আমি সহজেই তুলতে পারব তোমাকে, হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে।"

"কিন্তু আমায় না বলে কয়ে তুমি আমায় নামালে কেন? দেখ দেখি, আমি ব্যথা পেলাম! হুঁশিয়ার হয়ে লাফ দিলে ত আমার এতটুকুও লাগত না!"—আলাদিন রীতিমত রেগে জবাব দিল।

"আহাহা, কথাটা বুঝে দেখ! তোমায় বলে রাজী করিয়ে যদি নামাতে হত, সময় যেত কতখানি? অথচ বিশ্বাস কর আমার কথা, নষ্ট করবার মত সময় আমার মোটেই নেই। বহু যুগ বাদে আজকার দিনে ঠিক এই সময়টাতে একটা শুভক্ষণ এসেছে, তারই দরুন মন্তর আওড়ানোমাত্র এই গোপন দরোজা খুলে গিয়েছে পাথরের গায়ে। আবার এক্ষুণি বন্ধ হয়ে যাবে এই দরোজা, তখন হাজার মন্তর আওড়ালেও খুলবে না আর।"

ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে আলাদিন চেঁচিয়ে উঠল—"তাহলে আমায় তোলো, তোলো এক্ষুণি! ওরে বাবা, আমি বেরুবার আগেই যদি দরোজা বন্ধ হয়ে যায়—"

"তাই ত বলছি! তুমি তাড়াতাড়ি কর। যা বলছি, তাই কর ওজর-আপত্তি না তুলে।"

"কী বলছ? হীরে মুক্তো পকেটে ভরে নেব?"

"তাই নাও বাবা, তাই নাও। কিন্তু তার আগে তুমি তাকিয়ে দেখ ভাল করে, কোন এক জায়গায় এই গুহার ভিতরে একটা প্রদীপ আছে, আর একটা আংটি। ঐ দুটি তুমি আগে নিয়ে এস, হাত বাড়িয়ে দাও আমার হাতে। তারপর হীরে মুক্তো কিছু পকেটে ভরে চলে এস উপরে।"

আলাদিন খুবই অবাক্ হয়ে গেল। মূল্যবান্ হীরে মুক্তোর বদলে প্রদীপ ও আংটি! তার মনে কেমন সন্দেহ জাগল। তবু সে খুঁজতে লাগল কোথায় সে দুটি অমূল্য পদার্থ।

ঐ যে, সত্যিই ঘরের কোণে এক জায়গায় একটি নোংরা প্রদীপ রয়েছে, আর তারই পাশে মেজেতে পড়ে আছে মরচে-ধরা একটা আংটি।

আলাদিন তাড়াতাড়ি গিয়ে আংটিটা নিজের আঙুলে পরে ফেলল, আর প্রদীপটা তুলে নিল হাতে।

জিনিস দুটো আলাদিন পেয়েছে দেখে চাচা ডেকে বলল—"এইবার ও জিনিস দুটো আমার হাতে দিয়ে তুমি যত পার হীরে মুক্তো তুলে নাও পকেটে। পকেট ভরে গেলে তারপর আমি আমার পাগড়ি নামিয়ে দিচ্ছি তোমায়।"

আলাদিন কিন্তু বোকা নয়। চাচার হালচাল দেখে সে বুঝেছে প্রদীপ ও আংটি দুটি হাতানোই কাকার আসল মতলব। প্রদীপ আংটি হাতে পাওয়ামাত্রই যদি সে পালটা মন্তর আউড়ে দরোজা বন্ধ করে দিয়ে ভেগে পড়ে—

সর্বনাশ!

না। আগে এই কয়েদখানা থেকে না বেরিয়ে প্রদীপ আংটি চাচার হাতে দেওয়া হবে না। কক্ষণো না।

আলাদিন হাত তুলে প্রদীপ আংটি দিচ্ছে না দেখে চাচা ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, ঝাঁজের সঙ্গে বলছে—"কই? তুমি দেরি করছ কেন? দাও শীগগির! সময় পার হয়ে গেল যে!"

আলাদিনও সমান ব্যস্ত। কিন্তু ঝাঁজ না দেখিয়ে শান্তভাবে সে বলল—"দিচ্ছি চাচা! আগে তুমি আমায় তুলে নাও, তারপর দিচ্ছি প্রদীপ আংটি।"

চাচা রেগে উঠল—"না না, আগে দাও জিনিস দুটো। না দিলে আমি তুলবই না তোমাকে।"

আলাদিনের মনের সন্দেহ ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে। সে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছে এই ভেকধারী চাচাটির মতলব ভাল নয়। প্রদীপ আংটি একবার হাতে পেলে হয়, সে তক্ষুণি আলাদিনকে এইখানে ফেলে রেখে দরোজা বন্ধ করে চলে যাবে, আর আলাদিন না খেয়ে শুকিয়ে মরবে তিলে তিলে।

যদি আলাদিনকে তোলে, এই প্রদীপ আংটির জন্যই তুলবে।

সে শক্ত হয়ে বলল—"না চাচা, আগে আমায় তুলবে, তার পরে পাবে প্রদীপ আংটি।"

দুইজনে তর্কাতর্কি, রাগারাগি—চাচাও আগে ওকে তুলবে না, আলাদিনও আগে মাল হাতছাড়া করবে না—দুজনেই ঘোরতর অবিশ্বাস করছে দুজনাকে।

ঝগড়া যখন চরমে উঠেছে, হঠাৎ ঘড়াং ঘট্ করে আওয়াজ! গুহার উপরকার দরোজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, নিরেট পাথর এসে চেপে বসেছে ফাটল জুড়ে। আলাদিন হাহাকার করে চেঁচিয়ে উঠল—"চাচা! চাচা!"

আর চাচা! শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। চাচার আর সাধ্য নেই মন্তর আউড়ে

পাহাড়ের মাথা ফাটিয়ে দরোজা বার করবার। এখন আবার কত যুগযুগান্ত এই রত্নগুহা মানুষের অনধিগম্য থাকবে, কে তা জানে!

নৈরাশ্যে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চাচা পাহাড় ছেড়ে চলে গেল। এ-দুঃখ রাখবার কি জায়গা আছে? দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আশ্চর্য প্রদীপ তার হাতে এসেও ফসকে গেল! ঐ গোঁয়ার ছোকরা! চাচার ইচ্ছে হচ্ছে ঐ হতভাগা ভাইপোটার মুণ্ডু চিবিয়ে খায় কড়মড় করে।

আর সেই হতভাগা ভাইপো—

গুহার মাথায় দরোজা বন্ধ হয়ে গেল দেখে বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল তার। হয়েছে! সেই জ্যান্তে কবরই ঘটেছে তার ভাগ্যে। যা এড়াবার জন্যই সে আগেভাগে প্রদীপ আর আংটি দিয়ে দিতে অস্বীকার করেছিল।

দেখে সামনে এক বিকটাকার দৈত্য।

এখন উপায়?

সে চীৎকারের পর চীৎকার করতে লাগল—"চাচা! চাচা! চাচা! তুমি দরোজা খোলো! আমি আগেই তোমাকে জিনিস দিয়ে দেব। তোমার পায়ে পড়ি—তুমি দরোজা খোলো!"

নাঃ—খুলল না দরোজা। মর্মান্তিক হতাশায় আলাদিন লুটিয়ে পড়ল মেজেতে।

তার ডান হাতের অঙ্গুলিতে ছিল সেই মরচে-ধরা আংটি, আর বাঁ হাতে ধরা ছিল সেই মরচে-ধরা প্রদীপ। মেজেতে লুটিয়ে পড়তেই আংটিটা ঘষা খেলো মেজের পাথরে।

আর তক্ষুণি কড়কড় করে কোথায় যেন উঠল একটা বিকট আওয়াজ। ভয়ে মূর্ছা যেতে যেতেও আলাদিন সামলে নিল কোনমতে।

দেখে সামনে এক বিকটাকার দৈত্য। পাহাড়ের চূড়ার মতই তার প্রকাণ্ড দেহ,

গুহার ছাদ ফুঁড়ে যেন আকাশে উঠেছে। অমাবস্যার রাতের মতই সে কালো। মুলোর মত তার দাঁত, ভাঁটার মত তার দুটো চোখ বনবন করে ঘুরছে।

ঘরে যেন বাজ পড়ল। সেই দৈত্যই কথা কইছে—"মালিক! কী হুকুম, বল! আমি ঐ আংটির নফর। আংটি যার হাতে, তার যে কোন হুকুম আমি সাধ্যমত পালন করতে বাধ্য।"

আলাদিন চিঁ চিঁ করে জবাব দিল—"তাই যদি হয়, তাহলে এক্ষুণি আমায় উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দাও।"

মুখের কথা বেরুতে যেটুকু দেরি। তারপরই আলাদিন সবিস্ময়ে দেখল, গুহার পাথরের ছাদ কোন বাধা দিতে পারছে না, দৈত্যের হাত ধরে সে নীল শূন্যে উঠে যাচ্ছে।

চোখের পলক মাত্র। এই ত আলাদিনের বাড়ি। দরোজায় আলাদিনকে নামিয়ে দিয়ে দৈত্য সাঁ সাঁ রবে আকাশে উঠে গেল আবার, মিলিয়ে গেল অসীম শূন্যের নিবিড় নীলিমায়।

আলাদিন "মা, মা" করে চেঁচিয়ে উঠে আছড়ে পড়ল ঘরের দোরে।

তাজ্জব :—

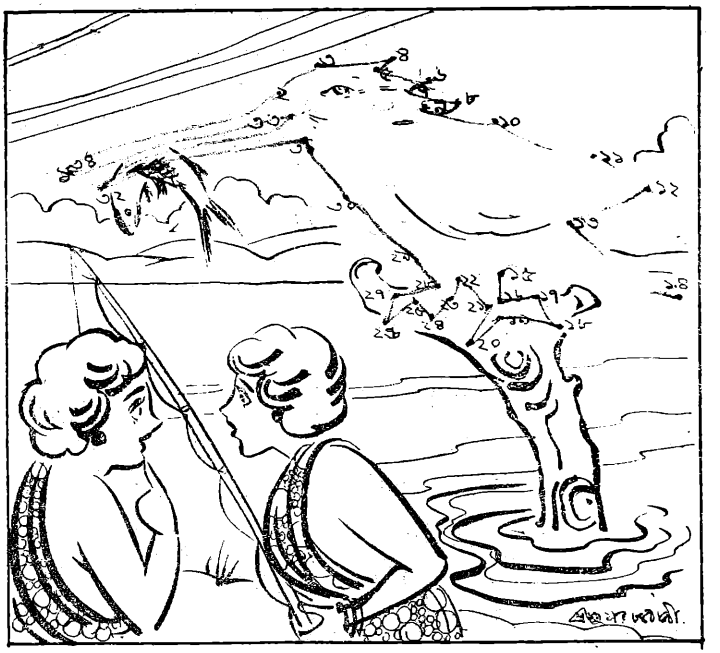

ছেলেদুটি মাছধরা বন্ধ করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কি বলছে? তাদের কথা জানতে হলে ১ থেকে ৩৪ সংখ্যা অবধি রেখা দিয়ে যোগ করতে হবে।

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

রাত তখন ঠিক আটটা বেজে পনের। অক্টোবর তিরিশ। উনিশশো আটত্রিশ। দিনটা ছিল রবিবার।

আর রোববার মানেই তো ছুটির দিন, বিশ্রামের দিন। রাতের শহর আলোয় আলোয় ঝলমলে। পথেঘাটে লোকের মেলা। সিনেমা থিয়েটারে ভিড় আর ভিড়। নাচঘরে নাচ গান বাজনা। দিকে দিকে কোলাহল হট্টগোল। আনন্দ—শুধু আনন্দ।

সেই আনন্দ হঠাৎ থমকে গেল বুঝি!

বেতারে বেতারে ভেসে এল ঘোষকের কণ্ঠস্বর: "অ্যাটেনশন প্লীজ···অ্যাটেনশন প্লীজ ···দিস ইজ কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেম···জরুরী ঘোষণা—ইয়েস কান্ট্রিমেন, দিস ইজ এ কোশ্চেন অব লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ···আজ আমাদের জীবন-মরণ প্রশ্ন, পৃথিবী এক দারুণ সংকটের সম্মুখীন।"···

সংকট? কিসের সংকট? চমকে উঠল সবাই। ভয় পেল। ছুটে এল। রেডিওর চারপাশে তখন ভিড়। মানুষের চোখে মুখে উদ্বেগ। কী হল—কেন এই জরুরী ঘোষণা?···

ধ্বনিত হল: "ইয়েস, দিস ইজ নাথিং বাট ওয়ার—যুদ্ধ। হাঁ, যুদ্ধ ছাড়া একে আর কিই বা বলা যেতে পারে? ইয়েস, ফুলস্কেল ওয়ার—পুরোপুরি যুদ্ধ।"

যুদ্ধ? হিটলার এবং মুসোলিনীর দাপটে তখন জগৎ জুড়ে আতঙ্ক। দিগন্তে দিগন্তে বিশ্বযুদ্ধের কালোমেঘ। মানুষের চোখে মুখে ভয়ের থরথরানি। তবে কি যুদ্ধটা আরম্ভ হয়ে গেল পুরোপুরি? রেডিওর ঘোষণা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল ছুটির আনন্দ।

না, মানুষের সাথে মানুষের যুদ্ধ নয়—গ্রহের সাথে গ্রহের যুদ্ধ। মঙ্গলগ্রহের সাথে পৃথিবীর। বিচিত্র এক যানে চেপে নেমে আসছে সেই গ্রহের প্রাণীরা। অদ্ভুত তাদের শক্তি —প্রচণ্ড তাদের ক্ষমতা। তারা মানুষের চাইতেও অনেক উন্নত জীব। তাদের দখলে রয়েছে অবিশ্বাস্য সব মারণাস্ত্র। সঙ্গে রয়েছে মৃত্যু-গ্যাস। গ্রহান্তরের মানুষদের হাতিয়ারের কাছে এ জগতের সবাই অসহায়। চোখের পলকে সব পুড়ে শেষ—জ্বলে ছাই। পাহাড় পর্বত সব

মোমের মত গলে গলে পড়ে—মানুষ তো কোন্ ছার! ওদের চোখে আজ বিশ্বজয়ের নেশা।…

আতঙ্কিত লোকজনেরা শুনছিল: "…দিস ইজ কলম্বিয়া…জেনিংস অবজারভেটরির প্রফেসর আপনাদের কিছু বলবেন ··আপনারা ধৈর্য ধরে শুনুন…অ্যাটেনশন প্লীজ…"

"…ইয়েস, প্রফেসর স্পীকিং…আমি আমার যন্ত্রে ধরতে পেরেছি…দেখতে পেয়েছি মঙ্গলগ্রহের বিস্ফোরণ। ঐ বিস্ফোরণের সাথে সাথেই নেমে আসছে ওরা ওদের যানে করে …উল্কার চেয়েও অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। …আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে।…নেমে পড়ছে পৃথিবীতে।"…

কিছুক্ষণ চুপচাপ। রেডিওতে একটানা ঘরঘর শব্দের পর ভেসে এল জলতরঙ্গের ঝঙ্কনা—যুদ্ধের সংগীত—ড্রাম আর বিউগ্‌লের ঐকতান।

রুদ্ধশ্বাসের সাথে সবাই শোনে: "…কলম্বিয়া স্পীকিং…দে আর ইন নিউজার্সি… ওরা নিউজার্সিতে নামল। যদিও ওদের কাছে আছে মৃত্যুরশ্মি তবু ভয় পায়নি আমাদের সৈন্যদল। আমাদের বীর যোদ্ধারা এগিয়ে গেছে…ঘিরে ফেলেছে মঙ্গলগ্রহের আগন্তুকদের।"

তারপর শুধু ঘোষণার পর ঘোষণা।…

·· "দিস ইজ কলম্বিয়া…যুদ্ধ বেধে গেছে·· প্রতিটি ইঞ্চির জন্যে মরণপণ সংগ্রাম। …এ যুদ্ধের উপর নির্ভর করছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ,…ডীয়ার কান্ট্রিমেন,·· প্রিয় দেশবাসীরা, আপনারা সাহস হারাবেন না।"…

·· "কলম্বিয়া স্পীকিং…আগন্তুকদের মৃত্যুরশ্মির কবল থেকে সাফল্যজনকভাবে পশ্চাদপসরণ করছে আমাদের সৈন্যরা। অসীম বীরত্বের সাথে চালিয়ে যাচ্ছে সংগ্রাম… আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হব · উই মাস্ট ফাইট টু দি লাস্ট…আমরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করব…জয় আমাদের অবধারিত।"…

রেডিওর ঘোষণার সাথে সাথে ভয়ের স্রোত ছড়িয়ে পড়ে যেন সারা শহরটায়। ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তাঘাট, সিনেমা-থিয়েটার, হোটেল-রেস্টুরেণ্ট। ভীতিবিহ্বল লোকজনের চোখে মুখে নিরাপদ্ আশ্রয়ের ব্যাকুলতা। গুজবে গুজবে তখন আতঙ্কের পর আতঙ্ক।

শুরু হয়ে গেল ছোটাছুটি। আবালবৃদ্ধবনিতা থরথরিয়ে কাঁপে। কী হবে—কোথায় যাবে এত সব লোকজন? প্রতি ঘোষণায় ঘোষণায় মৃত্যুর পদধ্বনি। আসছে—ওরা আসছে—এই ত এসে গেল!

বেতারে ঘোষকের কণ্ঠ যেন বার বার আর্তনাদ করে ওঠে। ফুটে ওঠে অসহায়ের সুর। আশ্বাস নেই, সুখবর নেই, শুধু যেন ক্রন্দন। পরাজয় আর পরাজয়।

চরম দুর্ভাগ্য নয়ত কি? পৃথিবীর বুকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে গ্রহান্তরের আগন্তুকেরা। হাতে তাদের মৃত্যু-পরোয়ানা। সমস্ত জগৎ এসে যাবে তাদের দখলে—হাতের মুঠোয়।

এই সংকটে চাই ধৈর্য, চাই সাহস। এই সাহসই আজ জনগণের সব—মস্ত প্রেরণা।

তাই রেডিওর ঘোষণার মাঝে মাঝে বেজে উঠতে লাগল দেশাত্মবোধক সংগীত—বাজতে লাগল যুদ্ধের বাজনা। যে সব বাজনা শুনলে প্রেরণা পাবে সবাই। হবে একজোট। সবার আগে ত দেশ। সেই দেশই যদি না রইল তবে কিসের সুখ, কিসের জীবন? আজ বিরোধ নয়, কলহ নয়—একতা। এক চিন্তা—স্বাধীনতা। এক কামনা—'ভিক্টরি'। উই মাস্ট উইন! আমরা জিতবই জিতব!

নেমে পড়ছে পৃথিবীতে।"··· [পৃষ্ঠা ৫৫৪

বেতার কণ্ঠে অল্পক্ষণ বাদে ধ্বনিত হল: "···কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং নিউইয়র্ক থেকে লোকাপসরণ শুরু হয়েছে। সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিপন্মুক্ত অঞ্চলে আপনারাও প্রস্তুত থাকুন···কিছুক্ষণের ভেতর আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আদেশ। প্রেসিডেন্টের নির্দেশ জানতে পারবেন।"···

জানতে বয়ে গেছে আতঙ্কিত লোকজনদের। কে করবে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা? প্রাণের ভয়ে সবাই প্রায় মরমর। মঙ্গলগ্রহের আগন্তুকের আতঙ্কে জ্ঞান হারাল অনেকে। মৃত্যুরশ্মির চেয়ে ত ইচ্ছামৃত্যু ভাল—আত্মহত্যার কথা ভাবছিল তখন কেউ কেউ।

আর পুলিস স্টেশনে বেজে উঠছে টেলিফোনের পর টেলিফোন: পুলিস অফিসার···আমরা কি করব? কোথায় যাব?···

…ওরা আসছে ··ওরা আসছে···মৃত্যু···নিশ্চিত মৃত্যু।

১৯৩৮ সালের ৩০শে অক্টোবরে সারা শহর জুড়ে দেড়ঘণ্টায় যেন সব ওলোটপালোট। সবাই টালমাটাল।

এমন সময় রাত সাড়ে নটায় আবার ঘোষণা বাজলঃ "আমাদের অনুষ্ঠান আজ এখানেই শেষ হল। আপনারা এতক্ষণ ধরে যে নাটকটি শুনছিলেন তার নাম হল—'মঙ্গলগ্রহ থেকে মানুষ'। পরিবেশনা ও ব্যবস্থাপনায় অরসন ওয়েল্‌স্ মারকারি থিয়েটার। আজকের নাটকে অংশগ্রহণ করলেন···।"

ঘাম দিয়ে জ্বর সারল যেন শহরবাসীর। তখনও অনেকের অবিশ্বাস। বিশ্বাস করতে না চাইলেও ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি সত্যি নাটক। চমক দেবার জন্যে নাট্যকার ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন ঘোষণার পর ঘোষণা। সত্যি করে তোলার জন্যে মাঝে মাঝে ছিল জলতরঙ্গের বাজনা, দেশাত্মবোধক গীতি।

আর সেই শহরে এমন সব গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে কার সাধ্য তখন অবিশ্বাসের। ভয়ের চোটে মানুষ সে সময় দিশেহারা। তখন ক্ষমতা কোথায় সত্যি মিথ্যে যাচাই করার?

তাই পরদিন নামকরা সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস্‌এ প্রকাশিত হল সবচেয়ে মজার খবর। বড় বড় হেডলাইনের সংবাদ—

যুদ্ধের নাটক সত্যি বলে ধরায় বিপত্তি।
বেতার শ্রোতাদের ভেতর দারুণ আতঙ্ক।

মঙ্গলগ্রহ নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণার আর অন্ত নেই। মঙ্গলে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কত না বাদ-প্রতিবাদ!

হ্যাঁ, সেটা ১৮৭৭ সাল।

ইতালীর বিজ্ঞানী মিঃ শিয়াপারেলী দেখতে পেলেন মঙ্গলগ্রহে সোজা সোজা কতকগুলো রেখা। বিস্তর গবেষণার পর বললেন এগুলো কৃত্রিম। জলসেচের জন্যে তৈরী করা হাতে-কাটা খাল।

কিন্তু কী করে তৈরী হল খালগুলো? কে কাটল?

বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করলেন বিজ্ঞানী—প্রাণী আছে মঙ্গলগ্রহে। আছে জীবন। এ খালগুলো মঙ্গলগ্রহবাসীদের তৈরী। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলে তারা বোধহয় আমাদের চেয়েও উন্নত। মানুষের থেকেও বড়।

আরম্ভ হয়ে গেল নতুন নতুন গবেষণা। শিয়াপারেলীর কথা মেনে নিলেন না অন্য

বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে রেখাগুলো শুধু রেখাই। কৃত্রিম না ছাই। এমনি কত রেখাই না আছে ঐ গ্রহে।

খালের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও কেউ কেউ আবার দেখতে পেয়েছিলেন নতুন কতকগুলো চিহ্ন। মঙ্গলগ্রহের গায় সবুজ সবুজ দাগ। গরমকালে বাড়তে থাকে—শীতকালে কমে যায়।

এই সবুজ চিহ্নগুলো কিসের? গাছপালা? না, উদ্ভিদ্‌জাতীয় অন্য কিছু? তার মানেই ত প্রাণের স্পন্দন।

প্রাণ অথবা প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে হলে চাই বিশেষ ধরনের জলবায়ু, আবহাওয়া,—চাই অক্সিজেন। অনেক গবেষকের মতে পৃথিবীর বাইরে একমাত্র মঙ্গলেই উদ্ভব হতে পারে প্রাণীর। মঙ্গলের আবহাওয়া নাকি কোটি বছর আগেকার আমাদের পৃথিবীর জলবায়ুর মত। বদলাতে বদলাতে একদিন চলে আসবে পৃথিবীর কাছাকাছি। স্পন্দিত হবে প্রাণের স্পন্দনে। এখন প্রাণ না থাক ক্ষতি কী? পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক কি মুছে যাবার মত? অনন্তকাল ধরেই সে আমাদের সাথী—প্রতিবেশী গ্রহ।

তাই সে গ্রহের প্রতি মানুষের কৌতূহলটা চিরদিনের। আদ্যিকাল থেকে মানুষকে হাতছানি দিয়ে চলেছে মঙ্গলগ্রহ। অপার রহস্যে মিটিমিটি হাসে। আকাশের কপালে জ্বলজ্বল করে। ঠিক যেন উজ্জ্বল এক লাল টিপ। লাল তারা। সুন্দর লাল তার রং।

এই লাল তারা দেখতে পেলে ভয় পেত প্রাচীন গ্রীসের লোকজন। তাদের কাছে লাল রঙ মানেই অকল্যাণ, যুদ্ধবিগ্রহ আর অশান্তির প্রতীক।

সেজন্যে তারা মঙ্গলগ্রহকে শুধু গ্রহ নয়, বলত দেবতা। যুদ্ধের দেবতা। পূজো করত, ভক্তি জানাত। যুদ্ধজয়ের জন্যে চাই মঙ্গলের আশীর্বাদ। তাই মঙ্গলকে খুশী কর, প্রণাম কর।

শুধু কি তাই?

আমাদের আকাশে একটা চাঁদ। মঙ্গলের আকাশে একটা নয়, দু দুটো চাঁদ—উপগ্রহ। সেই উপগ্রহদেরও প্রাচীন গ্রীসের মানুষেরা মানত। ভয় করত। ভাবত ওরা বুঝি যুদ্ধ-দেবতার বাহন—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একজোড়া ঘোড়া। নামও দিয়ে বসল—ফোবোস (ভয়) এবং ডেইমস (আতঙ্ক)। সে নামগুলো আজও চলছে।

হাঁ, যে কথা বলছিলাম।

আজ থেকে হাজার-লক্ষ বছর পরে পালটে যাবে মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া। হবে মানুষদের বাসের উপযোগী।

পৃথিবীর আবহাওয়াও নাকি বদলে যাবে ততদিনে। বিজ্ঞানীরা বলছেন—এ পৃথিবীতে

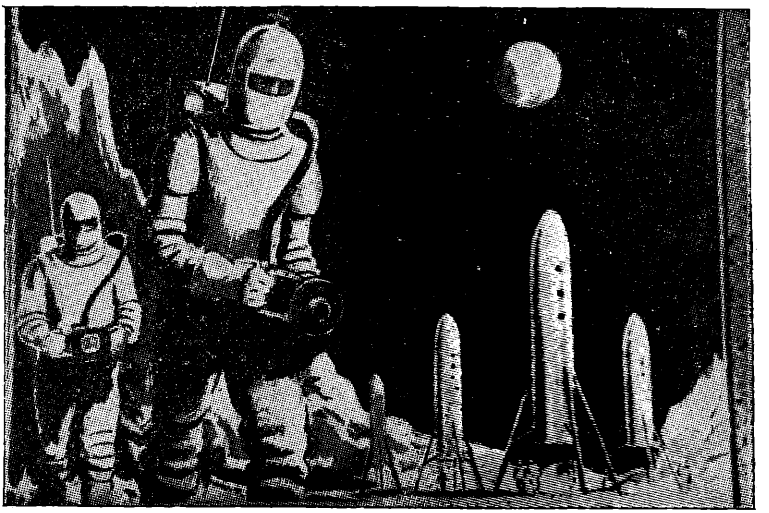

চাঁদে কিংবা অন্য উপগ্রহে যাবার পরীক্ষা চলছে

তখন শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত কিছুই থাকবে না। শ্যামলিমা হারিয়ে ফেলবে ধরিত্রী। চারিদিকে শুধু আগুনের হলকা! তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে ছাড়িয়ে যাবে নাকি স্ফুটনাঙ্কের উপর।

তবে কি মৃত্যু ঘটবে এই পৃথিবীর লোকজনের? সব শেষ? 'দি এণ্ড'?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, না। শেষ নয়—আমাদের শুরু। আমরা মহাকাশ যানে চেপে নতুন এক গ্রহে চলে যাবো। সবাই বাঁচবো মঙ্গলগ্রহে গিয়ে। নয়ত চাঁদে কিংবা অন্য কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহে। এখন থেকে তার পরীক্ষা চলছে।

সে সব ত অনেক অনেক বছর পরের কথা, কিন্তু তার আগে?

তার আগেও বিপদ্। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে নিঃশঙ্ক জীবন। দূর করেছে মহামারী, রোগ—বার করেছে তাকলাগান সব ওষুধ। এ যুগের মানুষেরা তাই বেশী দিন বাঁচছে। কমে গেছে মৃত্যুহার আশাতীতভাবে। এটা কি কম আনন্দ!

পৃথিবী বাড়ছে না কিন্তু মানুষ বাড়ছে। লোক বাড়ছে বছরের পর বছর। বাড়তে বাড়তে এমন এক সময় আসবে যখন সমস্ত জগৎ জুড়ে মানুষের ঠাসাঠাসি। পা ফেলার জায়গা নেই—দাঁড়াবার স্থান নেই।

ততদিনে হয়ত বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে কাগজে কাগজে—

আপনি কি গ্রহান্তরে জায়গা খুঁজছেন? চাঁদে যাবেন, না মঙ্গলগ্রহে? সস্তায় জমি পেতে হলে নিম্ন ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠান।···

পূরবী দেবী

২৬ নং বাড়ি থেকে সম্মিলিত কণ্ঠের ভয়ার্ত চীৎকারে পাড়ার লোকে সন্ত্রস্ত হয়ে সে বাড়ির সামনে এসে জড়ো হল।

কি ব্যাপার, কি হয়েছে, এত চীৎকার করছে কেন এরা ভেতর থেকে—কৌতূহলে সকলেই ফেটে পড়ার উপক্রম। কিন্তু কেউ ভেতরে ঢুকতে পারছে না। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। যত দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে ততই ভেতর থেকে আঁ আঁ শব্দ বেড়ে উঠছে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এই কলকাতা শহরেই।

রাস্তাটার নামটা এখানে বানিয়ে বলছি। শ্যামধন মিত্র লেন। এই রাস্তায় তের নম্বর বাড়িতে বাস করতেন এক বাঙ্গালী পরিবার। বাড়ির কর্তা ধনঞ্জয়বাবু বৃদ্ধ হয়েছেন। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বাড়ি বসে পেন্সন ভোগ করছেন।

বাড়িতে আছে ধনঞ্জয়বাবুর তিন ছেলে, বড় পুত্রবধূ আর ধনঞ্জয়বাবুর গৃহিণী। ধনঞ্জয়বাবুর সব ছেলেরাই সাবালক হয়ে কাজকর্মে ঢুকে উপার্জন করছে। বড় ছেলের বিয়ে হয়েছে। বাকি দুই পুত্র এখনও অবিবাহিত।

পরিবারের সকলের মধ্যে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা বেশ ভালই ছিল। কিন্তু ছেলেরা বুড়ো বাবার সঙ্গে একটা বিষয়ে কিছুতেই একমত হতে পারত না। তারা বলত,

বাবা বুড়ো হয়েছেন তাই বাই চেপেছে। যত সব অলীক কল্পনা। আজকের এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে এসব কথা কি কেউ মানে।

ধনঞ্জয়বাবু বলতেন, তোমরা ইয়ং বেঙ্গল। বুড়োরা তো তোমাদের চোখে ওল্ড ফল। কিন্তু যেদিন হাতেনাতে দেখবে সেদিন বিশ্বাস হবে ভূত আছে কি না।

বলা বাহুল্য ভূতের ভয়ে ধনঞ্জয়বাবু সদাসর্বদাই শিউরে থাকতেন। শনি মঙ্গলবার মানতেন। কোনদিনও সন্ধ্যের সময়ে বেলগাছের তলা দিয়ে হাঁটেননি। বেলগাছে যে ব্রহ্মদত্যি থাকে।

ধনঞ্জয়বাবুরা যে বাড়িতে থাকতেন, ছেলেরা বড় হতে সে বাড়িতে আর তাদের কুলোচ্ছিল না। বড় ছেলের বিয়ে হতে সকলের থাকার অসুবিধে বেড়ে যায়। তাই তারা সকলে মিলে ঠিক করে একটা বড় দেখে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে সকলে উঠে যাবে।

সেদিন বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যের সময়ে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বড় ছেলে জানালে একটা বড় বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে।

কথাটা শুনে বাড়ির কর্তা বাধা দিয়ে বলেন, থাক থাক আজ এ আলোচনা বন্ধ থাক। আজ বৃহস্পতিবার। কি জানি কি অমঙ্গল ঘটে যাবে।

ধনঞ্জয়বাবুর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে ছোট ছেলে বলে, বাবা যেন কি! বৃহস্পতিবার তো কি হয়েছে? আলোচনা করলে ভূত এসে ঘাড় মটকাবে নাকি!

রাম রাম রাম রাম!

ছোট ছেলের কথা শুনে ধনঞ্জয়বাবু কেবল দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাতে লাগলেন আর মুখে রাম রাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। তারপর বলতে লাগলেন, ঠাকুর, অপরাধ নিও না ওর। অবোধ বালক। অশরীরীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

এই বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ধনঞ্জয়বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হাসিমুখে বাড়ির আর সকলে মিলে নতুন বাড়ির আলোচনা করতে লাগল। ঠিক হল—আগামী শনিবার হাফ-ডে। সকাল সকাল বাড়ি ফিরে সকলে মিলে বাড়িটা দেখতে যাবে।

দেখতে দেখতে দু'দিন কেটে গেল। শনিবার এসে পড়ল। আড়াইটের সময় ছুটি হতে ধনঞ্জয়বাবুর তিন ছেলে পথে কোথাও দেরি না করে বাড়ি এসে হাজির হল। তারপর চা জলখাবার খেয়ে সকলে মিলে যখন বাড়ি দেখতে বেরোল তখন বেলা প্রায় সাড়ে চারটে।

সে সময়টা ছিল শীতকাল। পাঁচটার মধ্যেই আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। সাড়ে

পাঁচটার সময়ে সন্ধ্যে। তারা সকলে মিলে যখন বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল তখন ঘড়ির কাঁটা সাড়ে চারটে পেরিয়ে পাঁচটার দিকে এগোচ্ছে।

বাড়ির সামনে এসে দেখে বাড়ির দরজা বন্ধ। দোরে তালা ঝুলছে। কাছেই বাড়ির মালিকের বাসস্থান। দরজার চাবি দরোয়ানের কাছে থাকে। সকলকে বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতে বলে ধনঞ্জয়বাবুর বড় ছেলে চাবি আনতে মালিকের বাড়ির দিকে পা বাড়ালে।

একে অবেলা তায় শনিবার। দিনের আলো কমে আসছে। বাড়ির কড়ায় তালা ঝুলছে। বাড়ি দেখাবার জন্যে কেউ উপস্থিত নেই। এতগুলো অলুক্ষুণে লক্ষণ ধনঞ্জয়বাবুর মোটেই ভাল লাগল না।

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, থাক থাক, আজ আর চাবি এনে কাজ নেই। আরেক দিন দিনের আলোয় এসে ভাল করে দেখে গেলে হবে। এই অবেলায় অপদেবতাদের ঘুম ভাঙ্গে···

ধনঞ্জয়বাবুর কথা শেষ হবার আগেই তাঁর ছোট ছেলে বলে ওঠে, বাবার সব-তাতেই ভূতের ভয়। আরে ভূত তো আমরা। বইতে লেখা আছে না, পঞ্চভূতে গড়া আমাদের শরীর। দাদা, তুমি চাবি নিয়ে এস। আরো দেরি হলে অন্ধকার হয়ে যাবে, কিছু দেখা যাবে না।

ধনঞ্জয়বাবুর বড় ছেলে চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এল চাবি হাতে করে। চাবি নিয়ে তালায় দিয়ে যত জোরে ঘোরাবার চেষ্টা করে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, চাবি আর ঘোরে না। অনেক দিন তালাটা খোলা হয়নি বলে ভেতরে মরচে ধরে গেছে। বোঝা গেল এ বাড়িতে অনেক দিন কেউ ঢোকেনি। প'ড়ো বাড়ির মত পড়ে আছে এটা।

ধনঞ্জয়বাবুর বড় ছেলে বারকতক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, আমার দ্বারা হল না। তাই দেখে ধনঞ্জয়বাবু বললেন, ভালই হল, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। এই ভরসন্ধ্যের সময়ে ভূতের বাড়িতে না ঢোকাই ভাল।

ছোট ছেলের বয়েস এই সবে বাইশ। সরকারী অফিসে ভাল কাজে ঢুকেছে। বেশ বছর থেকে ব্যায়াম করায় শরীরটা বেশ বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাবার মুখে আবার ভূতের বাড়ি শুনে তার রোখ চেপে গেল। এগিয়ে এসে বললে, ধুত্তোরি ভূতের বাড়ি! সব যত সব কুসংস্কার। আজই এ বাড়ি দেখে যাব। এই বলে এগিয়ে এসে দরজার হাতলটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে চাবিটায় একটা রাম মোচড় দিলে।

কড়াৎ করে একটা শব্দ হল।

শব্দটা ইঙ্গিত করে একটু মুচকি হেসে ছোট ছেলে বললে, ঐ শোন, চাবির মোচড়ে ভূতটা কোঁৎ করে পালাল।

ছোট ছেলের ঠাট্টা শুনে ধনঞ্জয়বাবু বললেন, রাম রাম! অপদেবতাদের নাম নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই। কি জানি কখন কি হয়!

ধনঞ্জয়বাবুর কথার কোন জবাব না দিয়ে ছোট ছেলে দু'হাতে ঠেলে দরজা খুলে দিলে। সকলে বাড়িতে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল লাগিয়ে দিলে, পাছে কোন অজানা লোক অজান্তে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

বাড়ির দরজা বন্ধ করে তারা দল বেঁধে বাড়ির ছাতে গেল। তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। চারিদিক একটু একটু ঝাপসা হয়ে আসছে।

ছাতে উঠে তারা এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। বাড়ির পেছন দিকের ছাতে গিয়ে দেখে যে বাড়ির লাগোয়া একটা নতুন বাড়ি উঠছে। নতুন বাড়ির ভারা এসে এ বাড়ির গা ছুঁয়ে রয়েছে।

ছাত থেকে চারদিক দেখে ঘরটর পছন্দ করে যখন তারা বাড়ি থেকে বেরোবে বলে নিচে এসে নেমেছে, তখন ধনঞ্জয়বাবুর ছোট ছেলে হঠাৎ বলে উঠল, তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি শীগ্‌গির দেখে আসি।

কি দেখে আসবি?

সকলের মুখে চোখে বিস্ময়। ধনঞ্জয়বাবু স্পষ্টই বলে ফেললেন, কি দেখে আসবি?

গোসলখানা। বাড়িতে ঐটে ভাল না হলে থেকে সুখ নেই। এই বলে সে তাড়াতাড়ি বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে যায়।

ছোট ছেলে চলে যাবার একটু পরেই সকলে শুনতে পেলে তার ভয়ার্ত কণ্ঠের বাড়ি-ফাটানো চীৎকার—আঁা—আঁা—আঁা—

কি হোল, কি হোল বলে সকলে সেই দিকে দৌড়ল।

গোসলখানার কাছে পৌঁছে সকলে ছোট ছেলের মত ভয়ে পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করে দিলে।

সকলের সম্মিলিত কণ্ঠের চীৎকারে পাড়ার লোক সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ির সামনে এসে জড়ো হল। বাড়ির দরজা ঠেলে ডাকতে থাকে, অ মশাই শুনুন না, দরজাটা খুলুন না। হোল কি?

তারা যত দরজা ঠেলে তত চীৎকারের শব্দ বাড়তে থাকে। এসব কথা আগেই বলেছি।

শেষে নিরুপায় হয়ে পাড়ার লোক দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। ভেতরে প্রবেশ করে তারা এসে যখন পেছনে গোসলখানার কাছে দাঁড়াল, তাদের দেখে ধনঞ্জয়বাবুরা সাহস পেয়ে চুপ করলে।

তারা একটু শান্ত হতে পাড়ার লোকেরা প্রশ্ন করে, কি হয়েছিল মশাই, আপনারা অত চেঁচাচ্ছিলেন কেন?

ধনঞ্জয়বাবু বললেন, ভূ···ত ভূত। আছে ঐ গোসলখানায়।

ধনঞ্জয়বাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বড়, মেঝো, আর ছোট ছেলে একসঙ্গে সমর্থন করে, হ্যাঁ ভূত আছে ঐ ঘরে। আমরা নিজে দেখেছি।

দরজা খুলে যেতে দেখা গেল···

বার বার প্রশ্ন করে পাড়ার লোকে জানতে পারে যখন ধনঞ্জয়বাবুর ছোট ছেলে এসে ঐ খালি ঘরটা পরীক্ষা করতে দরজা ঠেলে, মনে হল কে যেন ভেতর থেকে দরজা চেপে ধরে আছে। তার পর একটা পাল্লা একটু খুলে একটা হাত সোজা বেরিয়ে আসতে থাকে। তাই দেখে ছোট ছেলে সেটা ভূতের হাত মনে করে আঁ আঁ করে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। তারপর একে একে সকলে এসে হাতটা দেখতে পায় আর পরিত্রাহি চীৎকার সুরু দেয়।

কথাটা শুনে পাড়ার একজন লোক গোসলখানার সামনে গিয়ে এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে দেয়। দরজাটা খুলে যেতে দেখা গেল একজন লোক হাত জোড় করে ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে। এত লোকের ভিড় দেখে ভয়ে কাঁপছে।

এই রকম জনশূন্য তালা-দেওয়া প'ড়ো বাড়িতে গোসলখানার ভেতর অচেনা লোক দেখে সকলের খুব কৌতূহল হয়। সকলে তাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলে।

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বেরিয়ে এল। তার চেহারা দেখে সকলেই বুঝতে পারলে সে একজন জনমজুর। তখন তাকে সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

লোকটার উত্তর শুনে বোঝা গেল, সে পাশের বাড়ি তৈরীর কাজে রোজই মজুরের কাজ করতে আসে। সেদিন বিকেলে তার টাট্টি পায়। এ বাড়িতে কোন লোকজন নেই দেখে ছাত দিয়ে নিচে নেমে আসে। সে যখন গোসলখানায় ছিল তখন বাড়িতে লোক এসেছে দেখে ভয়ে বেরোতে পারেনি। ভেবেছিল সকলে চলে গেলে বেরোবে। ধনঞ্জয়বাবুর ছোট ছেলে যখন গোসলখানার দরজা ঠেলে সে তখন সেটা ভেতর থেকে চেপে ধরে একটা পাল্লা খুলে হাত বার করে ঠেলতে নিষেধ করছিল। এ ব্যাপারটা যে এমন ঘোরাল হয়ে উঠবে একথা সে ভাবেনি। লোকটার কথা শেষ হতে সকলে হো হো করে হেসে উঠল। শুধু ধনঞ্জয়বাবুর ছোট ছেলে বললে, ভূত ভূত করে বাবা আমার ভেতর ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তাইতো হাতটা দেখেই ভয় পেয়ে গিছলুম।

বধূ

মৌসুমী মাইতি

মেয়েটি যায় কলস কাঁখে,
গাছের শাখে কোকিল ডাকে।
কলসে জল চলকে পড়ে,
আমের বোল হাওয়ায় নড়ে।
ঘরের পানে যায় সে ফিরে—
নূপুর বাজে চরণ ঘিরে।
সাঁঝের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে—
হাজার ফুল আকাশে ফোটে।

সবিতা ঘোষ

আমরা চারজনে—মানে আমি, আমার কর্তা, ছেলে ও মেয়ে ব্যাংককে এসেছি মাত্র পরশু দিন। 'একাফে' (Ecafe)তে তিনমাসের একটা চাকরি নিয়ে কর্তা এসেছেন—সঙ্গে আমরাও। 'থিপিয়া কোর্ট' বলে একটা বড় বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে উঠেছি। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছি। সামনে দিয়ে মস্ত চওড়া রাস্তা—'রাজবীথি'। থাই ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে, যদিও উচ্চারণ এতো বিকৃত যে বোঝা যায় না।

কাছেই একটা নদী আছে।

মেয়ে বললো—"চলো বাবা, সেই নদীর ওপর প্রকাণ্ড পোলটা কাল দেখেছি, সেখানে বেড়িয়ে আসি।"

পায়ে হেঁটেই পৌঁছনো যায়। ছোট ছেলে অম্বরও যেতে পারবে, কাজেই সেই দিকেই চললাম। বিকেল ছ'টা বেজে গেছে, পড়ন্ত বেলা, মঙ্গলবার অর্থাৎ আপিস ইস্কুলের দিন,—কাজের শেষে দলে দলে ছেলে, মেয়ে, ছাত্র, ছাত্রী, চাকুরে সবাই ব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে। রাস্তায় গাড়ির মেলা। যতো বা ভারী ভারী লরী, ততো 'পাবলিক বাস', আর তার চেয়েও বেশী অ্যামেরিকান বাহারে বাহারে 'প্রাইভেট কার', কি প্রচণ্ড গতিতেই রাস্তাটার দু'দিক দিয়ে অবিরাম আসছে যাচ্ছে! 'জেব্রা ক্রসিং'-টসিং কিছুই মানছে না। হর্ন দেবারও গরজ বা সময় নেই। যে তুলনায় চওড়া রাস্তা, ফুটপাথ সে তুলনায় খুবই সরু বলতে হয়।

যা হোক, আমরা খুব সন্তর্পণে লোকের বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলেছি গন্তব্যস্থানের দিকে।

পোলটার নাম 'সাপান সাংখে'। থাইভাষায় সাপান মানে পোল। পোলের কাছাকাছি এসে দেখি প্রকাণ্ড উঁচু পোলটার ওপর দিয়ে ঐরকম তীব্র বেগে সাঁ সাঁ করে গাড়ি চলেছে। পোলের ধার দিয়ে দিয়ে দু'পাশে বিশ্রী নোংরা কাঁচা সরু রাস্তা খানিকটা গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে পোলের ওপর উঠে গেছে। সেখানে পোলের দু'ধারে হেঁয়ে-চলার চওড়া বাঁধানো ফুটপাথ।

এই সরু কাঁচা রাস্তার সামনে এসে কর্তা ছেলেকে নিয়ে একটু এগিয়ে গেছেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে ভাবছি—বাব্বা, এই দুরন্তগতিশীল গাড়ির স্রোতে মানুষজন হাঁটে কি করে? আমরাই বা ছেলে মেয়ে নিয়ে ওখানে যেতে চাইছি কেন? যেমনি এ কথা ভাবা মুহূর্তমধ্যে একটা 'টেম্পো' গাড়ি—এখানে বলে 'সাম্‌লস্'—বিদ্যুৎগতিতে পিছন দিক থেকে এসে আমার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। আমি আর একটু হলেই ছিটকে পড়ছিলাম। কি করে যে চক্ষের পলকে এক পা মেয়ের দিকে সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচালাম কে জানে!

গাড়িটা সেই সরু কাঁচা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়িটা আমায় ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে দেখলাম যেন চালকের দাড়িতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এই কাঁচা সরু রাস্তা দিয়ে যে আবার গাড়ি যেতে পারে ভাবতেই পারিনি। না একটা হর্ন, না কিছু—ঐরকম গতিতে যে বাঁক ঘুরে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যায়, বিশ্বাস হচ্ছিলো না। আমার বুকের ধকধক 'প্যালপিটেশন' আর থামতেই চায় না। এক্ষুণি কি যে ঘটে যেতে পারতো ভেবে ভয় হচ্ছিলো।

যা হোক, পোলের ওপর উঠলাম।·· সেই অনবরত শত শত গাড়ি চলেছে পোল কাঁপিয়ে, ভয়ানক শব্দে আর কি দুর্বার গতিতে!

মেয়ে বলে উঠলো—"ও মা, দেখ গাছটাকে আকাশের গায়ে 'সিলোয়েট'এর মত কি সুন্দর দেখাচ্ছে!"

গাছ দেখতে গিয়ে আমার চোখে পড়লো কালো কালো, টানা টানা, লম্বা লম্বা মেঘের ফিতেতে আকাশ ছাওয়া। তারই ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর টকটকে লাল আভা। বুঝলাম সূর্যদেব মেঘের আড়ালে অস্ত যাচ্ছেন। আকাশকে কেন্দ্র করে গোটা দৃশ্যটাই কেমন করুণ ঠেকলো।

মনটা কেন জানি না সেদিকে তাকিয়েই হুহু করে উঠলো।

পোলের গায়ে ফুটপাথের ধার দিয়ে মোটা মোটা বাঁশের ভারা উপরে উঠে গেছে। কি যেন মেরামতি কাজ হচ্ছে। ওদিকে নীচে দিয়ে প্রকাণ্ড চওড়া ঘোলাটে নদী। অসংখ্য নৌকা। বড় বড় আকারের নৌকা, নানা জিনিসে বোঝাই। রেলের বগির মত লম্বা লাইনে একটার পেছনে একটা দাঁড়িয়ে গেছে, সব দড়ি দিয়ে সামনের নৌকার সঙ্গে বাঁধা। সবার আগে চলেছে একটি স্টিম লঞ্চ কিংবা মোটর বোট। সে-ই চলেছে এদের টেনে নিয়ে। দৃশ্যটা খুবই উপভোগ্য।

কিন্তু কেন জানি না আমার সমস্ত কিছু দেখেই কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব হচ্ছিলো। গা শিরশির করছিল। দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এলো। একটা, দুটো

করে নৌকায় আলো জ্বলতে শুরু করলো। আমার মনটা কেমন ভয়ে অসাড় হয়ে আসছিল। ঘোলাটে নদীটাকে দেখে ক্রমাগত হাওড়ার পোল থেকে দেখা গঙ্গার দৃশ্য যেন চোখে ভাসতে লাগলো।·· বাড়িঘর, দেশভূঁই ছেড়ে কোথায় কোন্ জায়গায় এসে পড়েছি! নিজেকে খুব একা-একা অসহায় মনে হতে লাগলো। আমাদের যেন কেউ নেই।

নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম —কতো তো দূর দূর দেশে গিয়ে অনেক দিন ধরে থেকে এসেছি, এমন তো কখনো মনে হয়নি! ভাবলাম, নদীটারই কারসাজি। ঘোলাজল নিয়ে গঙ্গাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। চকিতে মনে হলো বাংলা-দেশে আজ মহালয়া। এই সব ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। মেয়ে সেই 'সিলোয়েট' গাছ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, অনেকক্ষণ ধরে সেও নির্বাক্, মনে হলো কি ভাবছে। হঠাৎ দেখি আমাদেরই ফুটপাথে উলটোদিক দিয়ে একটি বারো চোদ্দ বছরের থপথপে মত ছেলে কেমন অসমান পা ফেলে এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে। সামনের সূর্যাস্তের চাপা আলোয় তার চেহারাটাও 'সিলোয়েট' হয়ে গেছে, কালো ছায়ার মত শুধু আকৃতিটা দেখা যাচ্ছে। হাঁটার ধরন দেখে কেমন ন্যালাক্ষ্যাপা লাগছিল।

আর দাড়ির কাছটা খুব ফোলা, ব্যাণ্ডেজবাঁধা।

[পৃষ্ঠা ৫৬৬

আমাদের কাছাকাছি এসে, অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটার দরুন—বাঁশের ভারার একটা বাঁশ ঠিক কপালবরাবর এসে শেষ হয়ে গেছে, শেষের সেই জায়গাটা দিয়ে তার কপালে ঠক করে সশব্দে বেশ জোর আঘাত লাগলো। ছেলেটা চোট খেয়ে যেন একটু আর্তনাদ করে উঠলো। কপালে হাত চাপা দিয়ে একটু বসলো।

আমরা দূর থেকে তাকে তাকিয়ে দেখছি, আমাদের সকলেরই মনে মনে খুব কষ্ট হচ্ছে বেচারা অত ব্যথা পেল বলে। আমরাও চলতে শুরু করেছি, আর সে উঠে কপালে হাত চাপা দিয়ে, ফুলে ফুলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের খুব কাছে এগিয়ে এসে অন্য হাতটা বাড়িয়ে থাইভাষায় কি সব বলে ভিক্ষে চাইলো।

কাছ থেকে তার মুখটা কেমন বীভৎস লাগলো। রগের ধারে, গালে কাটাছড়ার দাগ। দাঁতগুলো সব পোকাখাওয়া, ক্ষয়ে ক্ষয়ে সরু হয়ে গেছে। আর দাড়ির কাছটা খুব ফোলা, ব্যাণ্ডেজবাঁধা। ব্যাণ্ডেজবাঁধা দাড়ি দেখে চমকে উঠলাম—টেম্পো-চালকেরও তো পেছন থেকে মনে হচ্ছিলো ব্যাণ্ডেজবাঁধা। দূর হোকগে—এ থাইদের, মঙ্গোলিয়ান, মানে চীনেম্যানের মত দেখতে। সবাইকেই একরকম দেখায়। এইটুকু ছেলে আবার গাড়ি চালাবে কি! এদের আবার বয়সও বোঝা যায় না ছাই!···

কর্তার মায়া হলো। হাতে খুচরো না থাকায় একটা গোটা 'বাট'ই দিয়ে ফেললেন। 'বাট' হলো আমাদের এক টাকার মত দেখতে মুদ্রা। দাম আমাদের সাড়ে পাঁচ আনা—থুড়ি আজকাল কি আর ওসব বলা চলে—তেত্রিশ পয়সার মত। ছেলেটা একবার 'বাট'টাকে বেশ লক্ষ্য করে দেখে নিয়ে, কান্নাটান্না ভুলে, মাথা নীচু করে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উলটোদিকে চলে গেল। আমরা তার রকম দেখে অবাক্ হলাম। মনে হলো, আমাদের দেশের পথেঘাটে দেখা জাতভিখিরী।···হঠাৎ একটু পরেই দেখি কর্তা খুব ব্যস্ত হয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করছেন—"এ কিরে অম্বর, কাঁদছিস কেন?" আমরা তাকিয়ে দেখি ওর মুখ ছাইএর মত সাদা। হাত, পা ঘামছে। ও কাঁদতে কাঁদতে বললো—"বাবা, আর বেড়াবো না। এক্ষুণি বাড়ি ফিরে চল। বড্ড শরীর খারাপ লাগছে।"

আমাদের সবারই মনে হলো ঠিক শরীর খারাপ নয়, কোনো কারণে ও হঠাৎ খুব ভয় পেয়েছে। হয়তো সারা মুখে আঘাতের চিহ্ন, ব্যাণ্ডেজবাঁধা ছেলেটাই ওর ভয়ের কারণ। ও যখন এগিয়ে আসছিল, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমারই গা ছমছম করছিল। ছেলের অবস্থা দেখে আমরা পত্রপাঠ বাড়ির দিকে পা চালালাম। মায়াও বলতে লাগলো—"মা, আজকের বেড়ানোটা একটুও ভাল লাগলো না। গাড়ির ভয়ানক আওয়াজ, আর সর্বক্ষণ পোলটা 'ভাইব্রেট' করে করে কাঁপছিল, কেমন বিশ্রী লাগছিল। একটা 'আনক্যানি ফীলিং' হচ্ছিলো পোলের ওপর। আমি এতোবড় মেয়ে, আমি তো আর অম্বরের মত কাঁদতে পারি না।" আমি বললাম—"পোল কাঁপছিল বলে তোর ভয় ধরে

...ল ! আর আমার সেই টেম্পো চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে বুকের মধ্যে যে ...পুনি ধরে গেছিলো, তার সঙ্গে পোলের কাঁপুনি মিলিয়ে—তবে বোঝ আমার কেমন ...র করছিল !”

কথা বলতে বলতে এতোক্ষণে আবার সেই কাঁচা কাদামাখা রাস্তাটার ফুটপাথ—...ন সে এতোই সরু যে দুখানা পায়ের পাতা জোড়া করে কোনরকমে রাখা যায় তার ...পর এসে গেছি।

মায়া মনে করিয়ে দিল—“মা, আবার সেই রাস্তাটা, সাবধানে চল।”

আগের বারের মত পেছন থেকে গাড়ি আসছে কি না, একসঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে দুজনেই ...খে নিলাম। বাবা, ছেলে দু’চার পা এগিয়ে গেছে। ঠিক তক্ষুণি সামনের দিকে ...কছু দূরে একটা গাড়ির আলো ঝলসে উঠলো। পাশ কাটিয়ে যখন বাঁক ঘুরে গেল, ঘাড় ...ুরিয়ে দেখে মনে হলো গাড়িতে কোন চালক দেখলাম না। কিন্তু মুহূর্তে বাঁকের মুখে অদৃশ্য ...য়ে গেল—কি দেখলাম, না দেখলাম বোঝার আগেই। যাক বাড়ি গিয়ে সকলেই হাঁপ ...ড়লাম।

আমরা বলাবলি করতে লাগলাম—সবাই মিলে অমন ভয় পেয়ে গেলাম কেন ...ড়াতে বেরিয়ে ?

কর্তা বললেন—“হ্যাঁ, তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমিও ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। ...স্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে—যত জোরেই যাক না, আমরা তো ফুটপাথেই ছিলাম, ...তে ভয় কি ? অ্যাকসিডেণ্ট তো কিছু হয়নি।...”

পরদিন কাগজ খুলে দেখা গেল গত সপ্তাহে মঙ্গলবার যে ছেলেটি পোলের ওপর ...ড়ি চালাতে গিয়ে পোলে ধাক্কা লাগিয়ে সীট থেকে ছিটকে পড়ে মারা গেছে তার ফটো ...রিয়েছে—গোল চাকামুখ, মোটাসোটা, চোদ্দ পনর বছরের ছেলে, দাড়িতে ফেট্টি বাঁধা। ...কে সনাক্ত করা গেছে। সে একটি আধপাগলা রাস্তার ছেলে, পোলের কাছাকাছিই ...ক করতো। হঠাৎ একটা খালি টেম্পো গাড়ি পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ...ড় বসে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ ‘স্টার্ট’ দিয়ে ফেলেছিল। তার পর পোলে ...ক্কা খেয়ে পড়ে যায়। গাড়িটা চালকবিহীন অবস্থায় একটু চলবার পর সেটাকে ...না হয়।...

আমরা কাগজ পড়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

একটি জামার গল্প

শিশির মজুমদার

এক ছিলেন রাজা।

তাঁর মন্ত্রী নেই, সান্ত্রী নেই। দাস নেই, দাসী নেই। গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই। বলতে গেলে রাজার যা যা থাকা উচিত, তার কিছুই নেই—এমন কি রানীও নেই।

তবুও রাজা। পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে তাঁর রাজ্য। পাঁচখানা গ্রামের সবাই রাজার নামে মাথা নোয়ায়।

পাঁচখানা গ্রামের শেষ প্রান্তে ঝিলমিলে এক নদী। তারই ধারে রাজার বাড়ি। হর্ম্য-অট্টালিকা নয়, ছিমছাম সাজানোগোছানো ছোট্ট একতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশ ঘিরে আছে সবুজ মাধবীলতা। তার ওপর খেলে বেড়ায় লাল-নীল, হলুদ-কালো সব খুদে খুদে পাখি। রাজা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ির বারান্দায় এসে বসেন। পাঁচখানা গ্রাম থেকে আসে প্রজারা নানারকম আরজি-ফরমান নিয়ে। রাজা শোনেন, বিধান দেন।

পাঁচখানা গ্রাম পেরিয়ে ঝিলমিলে নদী। ঝিলমিলে নদী পেরিয়ে আরেক রাজ্য। সেখানে আরেক রাজা। মন্ত্রী-সান্ত্রীতে গমগম। ঢাল-তলোয়ারে ঝমঝম। দাস-দাসী গাড়ি-ঘোড়ায় গিজগিজ।

সেখানে আকাশ-ছুঁই-ছুঁই বিরাট বাড়ি। তার উপর পতপত করে উড়ছে এক নিশান, তাতে শকুনের মুখ আঁকা। সেখানে অগুন্তি ছোট-বড়ো ঘর। তার তিনটিতে থাকেন তিন রানী।

সেই হল রাজ্য, সেই হলেন রাজা।

ইয়া এক মোটা গোঁফ সেই রাজার নাকের নীচে। তাতে তা দেন তিনি সকাল-সন্ধ্যা, এমনকি ভরদুপুরেও!

রাজার দরবার বসে তখন। রাজা গোঁফে তা দিতে দিতে প্রজাদের কথা শোনেন কি শোনেন না। মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়েন,—কোতোয়াল, বন্দী কর, শূলে চড়াও, ইত্যাদি।

প্রজারা আসে দূর দূর গ্রাম থেকে, আরজি-ফরমান নিয়ে, সঙ্গে আনতে হয় দামী দামী নজর। পারুক আর নাই পারুক আরজি নিয়ে দরবারে ঢুকতে গেলে তাদের দামী দামী নজর দিতেই হবে। পারুক আর নাই পারুক চোখ কান নাক বুঁজে দিতে হবে বছরে বছরে খাজনা।

এই হলেন পঞ্চাশখানা গ্রামের রাজা। প্রজারা বলে, গোঁফু রাজা।

একদিন রাজা শুনলেন এক খবর। এক কান দু' কান তিন কান হয়ে রাজা শুনলেন খবর। পাঁচখানা গ্রামের রাজা নাকি কাপড় দান করছেন। কিসের কাপড়, কিসের কাপড়—শোনা গেল, জামার কাপড়। এক অদ্ভুত জামা।

গোঁফে তা দিয়ে গোঁফু রাজা হুংকার দিয়ে উঠলেন,—কোতোয়াল, বন্দী কর, ফাঁসি দাও, শূলে চড়াও।

কোতোয়াল পড়ল বিপদে। কাকে বন্দী করবে, ফাঁসি দেবে, শূলে চড়াবে! এদিক চায়, ওদিক চায়, কোন প্রজাই পায় না।

শেষে তাকিয়ে দেখে দরবারের এক কোণে একটা বেড়াল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবা চাটছে। কোতোয়াল তাড়াতাড়ি বেড়ালটাকে বন্দী করে ফাঁসি দিয়ে রাজাকে খবর দেয়।

বেড়ালটাকে ফাঁসি দিয়ে রাজাকে খবর দেয়।

রাজা খুশী হয়ে গোঁফে তা দেন ঘনঘন। কোতোয়ালকে ছুঁড়ে দেন একটা মোহর। আর কোতোয়াল অহংকারে সাত হাত বুক ফুলিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে চলে যায়। মনে মনে বলে, কেয়া কিয়া, কেয়া কিয়া!

আবার একদিন খবর আসে। পাঁচগ্রামের রাজা পঞ্চাশগ্রামের দীন-দুঃখী প্রজাদেরও কাপড় দান করছেন। কোন দুঃখী তাঁর কাছে গেলে শুধু হাতে ফিরে আসে না।

গোঁফু রাজার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। আবার হুংকার ছাড়েন,—কোতোয়াল, বন্দী কর, শূলে চড়াও।

কোতোয়াল পড়ে মুশকিলে। এবার তো আনাচেকানাচে কোথাও বেড়ালটেড়াল নেই কি করা! কি করা!

কোতোয়ালের সাত হাত উঁচু বুক এক হাতে নেমে আসে। ঘনঘন দোলানো মাথা স্থির হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ছোটে সে সান্ত্রীর কাছে।

সান্ত্রী সব শুনে তাকে পঞ্চাশখানা গ্রামের দীন-দুঃখী প্রজাদের আস্পর্ধার কাহিনী শোনালে। বললে, রাজা ওদেরই বন্দী করে শূলে চড়াতে বলেছেন।

সান্ত্রীর কথা শুনে কোতোয়াল তো দে ছুট দে ছুট। দীন-দুঃখী প্রজাদের একেবারে বন্দী করে শূলে চড়িয়ে একটা বড়ো নিঃশ্বাস টানে। আর কি, সঙ্গে সঙ্গে তার এক হাত বুক লাফ দিয়ে সাত হাতে উঠে পড়ে। স্থির মাথাটা ঘনঘন নড়তে থাকে।

গোঁফু রাজার কাছে আবার খবর আসে। সাংঘাতিক খবর। খবর শুনে রাজা গোঁফে তা দিতে ভুলে গেলেন। চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন, কোথায় মন্ত্রী! দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন,—মন্ত্রী!

মন্ত্রীমশাই ছিলেন বেশ। খানদান আর পড়ে পড়ে ঘুমোন। কাজের মধ্যে কাজ ভরদুপুরে রাজার পাশে গিয়ে বসা। তা বসে বসেই চলে ঝিমুনো। কিন্তু এবার কি ঝঞ্ঝাট!

আড়মোড়া ভেঙে মন্ত্রীমশাই তাড়াতাড়ি কাছা গুঁজতে গুঁজতে ছুটলেন গোঁফু রাজার কাছে।

মন্ত্রীকে দেখে রাজা বললেন,—মহা সর্বনাশ হয়েছে!

মন্ত্রী তো অবাক্। এমন কথা তো রাজার মুখে শোনা যায় না। জিজ্ঞাসা করেন মন্ত্রী,—কি সর্বনাশ?

রাজা বললেন,—প্রজারা সব আমার রাজ্য, ছেড়ে পাঁচগ্রামে চলে যাচ্ছে।

এ তো সত্যি সর্বনাশের কথা। সব প্রজা যদি চলে যায়, তবে কিসের রাজ্য, কিসের রাজা!

কি উপায়! কি উপায়!

মন্ত্রী ভাবতে ভাবতে কষে টেনে নেন ইয়া এক টিপ নস্যি। নস্যির ঝাঁঝে ঘুম-ঘুম ভাবটা পালায় বাপ বাপ বলে।

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেন সমস্ত ঘটনা। জিজ্ঞাসা করতে করতে শোনেন পাঁচগ্রামের রাজার অদ্ভুত জামার গল্প।

রাজা বললেন,—যত নষ্টের মূল ঐ জামা। আমি পাঁচগ্রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কেড়ে নিয়ে আসবো ঐ জামা।

মন্ত্রী বললেন,—না না, সর্বনাশ হবে। প্রজারাই যে আপনার বিরুদ্ধে।

রাজা পড়লেন ভাবনায়। তবে কি করা!

এতোদিন পর মন্ত্রীমশাই পেলেন একটা কাজের মতো কাজ। তাই তাড়াতাড়ি হাসি দিয়ে বললেন,—সে ভাবনা আমার। ফন্দি করে রাজাকে কুপোকাত করবো।

মন্ত্রীমশাই ফন্দি এঁটে পাঁচগ্রামে এলেন। জামার বিষয়টা কি ভালো করে জানা দরকার। খোঁজ করতে করতে জানলেন বিষয়টা। পাঁচগ্রামের রাজা বড়ো দানবীর। দরশীল। নিজে থেকে কিছুই চান না প্রজাদের কাছে। প্রজারা নিজ ইচ্ছায় ভালোবেসে রাজাকে নজর দেয়। যা দেয় তা রাজার নিজের ভালোভাবে চলেও থাকে ঢের। রাজা তো অর্থ বিলাসী নয়, তাই খরচও বেশী নেই। দুপুরে কোন দীন-দুঃখী রাজার কাছে এলেই হল। হাতের কাছে থাকে দিয়ে দেন সব।

একদিন হয়েছিল কি, ভরদুপুরে রাজা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছেন এমন সময়ে এল এক থুত্থুরে বুড়ো। কিছু ভিক্ষা চায়। সেদিন আর কিছু ছিল না, ছিল কিছু মোহর। রাজা মুঠো ভর্তি করে তাই তুলে দিলেন বুড়োর হাতে। আর বুড়ো তাই দেখে তার ছেঁড়া পুটুলি থেকে বের করে দিল একটা সাদা ধবধবে জামা।

রাজা বলেন, একি, একি!

বুড়ো বলে, নাও বাবা, এটা বুড়োর আশীর্বাদী। এটা তুমি পরবে, কাউকে কিন্তু দিও না।

রাজার কানের কাছে কি একটা বলে বুড়ো চলে যায়।

এক দিন দু'দিন পর রাজা যান বুড়োর গোপন কথা ভুলে। শুধু মনে থাকে বুড়ো বলেছিল জামাটা পরতে।

কৌতূহলে রাজা একদিন পরে ফেললেন জামাটা। আর যায় কোথা! মার মার কাট কাট করে কোত্থেকে এল একশ' তিন ডিগ্রি জ্বর। রাজার তখন জ্বরের তাড়ায় মনে পড়ে বুড়োর গোপন কথা। তাড়াতাড়ি জামা খুলে ফেললেন তিনি। ব্যস, জ্বরও গা থেকে পালাল কোথায়।

তারপর একদিন বুড়োর গোপন কথা মতো দিনক্ষণ দেখে রাজা পরলেন সেই জামা। তার পর থেকে প্রতিদিন ভোরে উঠে রাজা দেখেন জামা বেড়ে যাচ্ছে। বাড়তে বাড়তে হাঁটু ছাড়িয়ে মাটিতে গিয়ে লোটে। রাজা তক্ষুণি কাঁচি দিয়ে কুচকুচ করে কেটে ফেললেন বাড়তি অংশ। ধীরে ধীরে জামার বাড়তি অংশে ভরে যায় রাজার ঘর। রাজা তখন দীন-দুঃখী ডেকে ডেকে বিলোতে লাগলেন সেই কাপড়।

পঞ্চাশগ্রামের মন্ত্রীমশাই শুনলেন এই গল্প। শুধু বুঝতে পারলেন না কবে ঐ জামা পরায় রাজার এসেছিল জ্বর। যাই হোক, ফন্দিটা খুব জোরসে এঁটে মন্ত্রীমশাই এলেন পাঁচগ্রামের রাজার কাছে—একেবারে ভরদুপুরে।

রাজা তখন বিশ্রাম করছেন। দেখলেন, এক থুত্থুরে বুড়ো ভিখিরী দরজায় দাঁড়িয়ে। তিনি তাড়াতাড়ি এসে বললেন, কি চাই ?

বুড়ো ভিখিরী বললে, কিছু চাই না, দুটো ভিক্ষে চাই।

রাজা ঘরের ভেতরে ঢুকে কিছু খাবারদাবার আর সেই ধবধবে সাদা জামার বেশ কিছু বাড়তি অংশ এনে বুড়োর হাতে দিতে গেলেন।

বুড়ো বললে, এসব চাই না।

রাজা বললেন, তবে কি চাও ?

বুড়ো বললে, তোমার গায়ের ঐ জামাখানা চাই।

সর্বনাশ! রাজার গায়েই ছিল ঐ জামা। আজকাল রাজা প্রায় সব সময়ই ঐ জামা গায় দিয়ে থাকেন। জামা যত বেশী বাড়বে, ততই প্রজাদের লাভ। প্রতিদিন কত দীন-দুঃখী লোক যে তাঁর দুয়ারে আসে তার হিসেব নেই। কিন্তু বুড়ো ভিখিরী বলে কি!

রাজা বললেন, তুমি অন্য কিছু চাও না ভাই!

বুড়ো নাছোড়বান্দা। সে ঐ জামাই চায়। হয় ওটা দিক, নয় সে চলে যাবে।

কিন্তু তা কি করে হয়। পাঁচগ্রামের রাজার কাছে কেউ কোনদিন চেয়ে কিছু পায়নি—এমন কখনো হয়নি। কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া চাওয়া তো কেউ কখনো চায়নি। রাজা ভাবেন, নিশ্চয়ই এর পেছনে কিছু অভিসন্ধি আছে। তার পেছনে কেউ নিশ্চয়ই লেগেছে। যাক, লাগুকগে। পাঁচগ্রামের রাজা কারো ক্ষতি কখনো করেনি, সে কোন ঝামেলায় যেতে চায় না। এই জামাটাই যখন বুড়োর একমাত্র বাসনা—কি আর করা, দিতেই হবে।

রাজা একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে গা থেকে খুলে ওটা বুড়োর হাতে তুলে দেন। বুড়ো বিড়বিড় করে কি বলে চলে যায়।

জামাটার ছিল আরেকটা মজা। শুধু যে দিনক্ষণ দেখে পরলেই ভালো হয়, তা নয়। জামা যে দেবে সে খুশী হয়ে ভালো মনে দিলেই কাজ হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে হল অন্যরকম। রাজা অনিচ্ছার সঙ্গেই জামাটা দিলেন।

পাঁচগ্রামের রাজা ভাবলেন, একদিন এক বুড়োই এটা দিয়ে গিয়েছিল, আজ আরেক বুড়োই এটা নিয়ে গেল।

কিন্তু আজকের বুড়োটা যে পঞ্চাশগ্রামের সেই দজ্জাল মন্ত্রী, তা তিনি জানতে পারলেন না।

মন্ত্রী তো জামা নিয়ে বুক ফুলিয়ে ফিরে চললেন পঞ্চাশগ্রামের দিকে। মনে মনে আঁটলেন আরেক নতুন ফন্দি। মন্ত্রী ছিলেন এতোদিন ঘুমিয়ে, তাই তাঁর বুদ্ধিগুলো খাটতে পারেনি—এবার জেগেছেন মন্ত্রী, তাই তাঁর বুদ্ধিগুলো খুব খাটতে লাগল।

মন্ত্রী ফন্দি আঁটলেন গোঁফু রাজাকে ফাঁকি দেবার। মনে মনে গাল দিলেন রাজাকে,—বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি! জামা পাওয়ার শখ! এঃ, জামা দেবো আমি কচু!

পঞ্চাশগ্রামে গিয়ে মন্ত্রী খুব গম্ভীরভাবে রাজাকে বললেন, না, হল না। পাঁচগ্রামের রাজার খুবই আস্পর্ধা!

রাজা গোঁফ চুমড়ে বললেন, কেমন, আমি বলেছিলাম না! তবে এবার যুদ্ধের জন্যে তৈরী হই!

মন্ত্রীও গোঁফ চুমড়ে বললেন, যুদ্ধ তো হবে বৈকি। এক্ষেত্রে যুদ্ধ ছাড়া আর উপায় নেই। তবে একটু সবুর করতে হবে। প্রজাদের মতিগতি বোঝা দরকার।

অগত্যা রাজা চুপ করলেন। মন্ত্রী চলে গেলেন ফন্দি আঁটতে আঁটতে। জামা যে হাতানো হয়েছে, এ খবর যেন রাজার কানে না ওঠে। সান্ত্রীকে ডেকে বললেন, পাঁচগ্রামের রাজার ভারী আস্পর্ধা, বুঝলে! জামা চাইলাম আমি, আর দিলে এক ফকিরকে!

মন্ত্রীর কথায় সান্ত্রী তো গলে জল। যে সে কথা! মন্ত্রীমশাই আজ তার সাথে কথা কইছে! সে তাড়াতাড়ি বেরুলো পাড়া বেড়াতে। মানে আর আর বন্ধুদের কথাটা বলতে।—জানিস, মন্ত্রীমশাই আজ আমার সঙ্গে কথা কয়েছে। সান্ত্রী চলেছে গদগদ হয়ে। বুক ফুলিয়ে, পায়ের জুতোয় ঠকঠক শব্দ তুলে।

আস্তে আস্তে কথাটা রটে গেল। রাজা গোঁফে তা দিতে দিতে শুনলেন। ডাকলেন মন্ত্রীকে।

—এ কি শুনি মন্ত্রী!

—কি মহারাজ?

—পাঁচগ্রামের রাজা নাকি জামাটা এক ফকিরকে দিয়ে বসেছে।

—তাই তো বলছিলাম সেদিন, পাঁচগ্রামের কি দুঃসাহস!

রাজামশাই গুম মেরে গেলেন। মন্ত্রীমশাই সে সুযোগে তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।

এদিকে সাদা ধবধবে জামাটার গায়ে পাঁচগ্রামের রাজার অনিচ্ছার সেই নিঃশ্বাসটা কালো হয়ে উঠেছে। মন্ত্রীমশাইএর বাক্স থেকে একদিন সেই অনিচ্ছার নিঃশ্বাসটা কালো ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে এসে ঘর ভর্তি করলো। সেই ঘরে ছিল তাঁর ছোটছেলে, লাগলো তার গায় আর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল, উঠলো না আর।

তারপর সেই ঘরে ঢুকলেন মন্ত্রীমশাই নিজে, তাঁর গায়েও লাগলো সেই কালো ধোঁয়া তিনিও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন, জ্ঞান ফিরলো তিন দিন পর।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভাবতে লাগলেন মন্ত্রীমশাই, কেন এমন হল! কেন এমন হল!

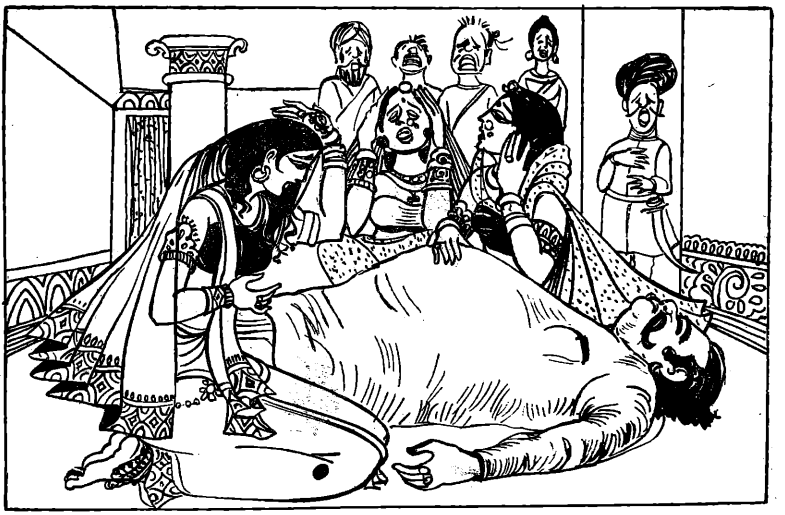

হুহু করে কাঁদলেন তিন রানী। [পৃষ্ঠা ৫৭৭

ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো জামার কথা। তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে বার করলেন জামাটা। দেখলেন, সাদা জামাটা কেমন কালো হয়ে গেছে। মন্ত্রীমশাই বুঝলেন, এটা অলুক্ষুণে হয়ে গেছে। এটা আর তাঁর কোন কাজেই আসবে না।

মন্ত্রীমশাই ফন্দি আঁটলেন, এটা দিয়েই গোঁফু রাজাকে জব্দ করতে হবে।

তক্ষুণি ওটা হাতে নিয়ে রওনা দিলেন রাজবাড়ি।

রাজার কাছে গিয়ে বললেন, এনেছি রাজামশাই, জামা এনেছি।

রাজা বললেন, কি করে পাওয়া গেল জামাটা ?

মন্ত্রী বললেন, সেই ফকিরটা এসেছিল গায়ে দিয়ে। আর কি, ধরলাম তাকে চেপে। সহজে কি দেয়, ওকে মেরে তারপর জামাটা নিয়ে আসতে পেরেছি।

রাজা জানতেন না ওটার আসল রঙ কি ছিল। তাই কোন সন্দেহ তাঁর মনে এলো না। মহাখুশিতে তক্ষুণি চাপালেন গায়ে। অবস্থা বুঝে মন্ত্রীমশাই সরে পড়লেন গুটিগুটি পায়ে।

আর কি! কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার গাটা কেমন ছমছম করে উঠলো। মাথাটা খলখল করে খুবলে উঠলো। রাজা এক হাত দিয়ে মাথা আরেক হাত দিয়ে গাটা জাপটে ধরলেন। তারপরেই অসাড় হয়ে পড়ে গেলেন, উঠলেন না আর।

সান্ত্রী এসেছিল কি এক খবর দিতে। ডাকলো, রাজামশাই, রাজামশাই !

কোন উত্তর নেই, কোন সাড়া নেই।

ভয়ে ভয়ে গায় হাত দিল সান্ত্রী। গা বরফের মতো ঠাণ্ডা। কনকন করে হাত। দেখলো, কালোকুট্টি এক জামা গায়ে রাজামশাই নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছেন।

ছুটে গিয়ে সে বৈদ্যমশাইকে ডেকে আনে। বৈদ্যমশাই নাড়ি টিপে বলেন, সব শেষ।

হুহু করে কাঁদলো সান্ত্রী। সান্ত্রীর কান্না শুনে এলো কোতোয়াল। হুহু করে কাঁদলো কোতোয়াল। ওদের কান্না শুনে এলেন তিন রানী—হুহু করে কাঁদলেন তিন রানী। কাঁদলো হুহু করে সমস্ত রাজবাড়ি।

ওদিকে মন্ত্রীমশাই বাড়িতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন, গোঁফু রাজা মরবে কখন। ও মরলেই তো আমি রাজা হবো, রাজত্বি পাব।

ভাবতে ভাবতে তিনি দেখলেন তাঁর ঘর নীল নীল জলে ভরে গেছে। ধীর স্থির। কি ঠাণ্ডা, কি ঠাণ্ডা! কে যেন তাঁর চোখের পাতা দুটিতে প্রজাপতির নরম পাখা বুলিয়ে দিচ্ছে। মন্ত্রীমশায়ের ঘুম পাচ্ছে—ভীষণ ঘুম। মন্ত্রীমশায়ের ক্লান্তি লাগছে—ভীষণ ক্লান্তি। মন্ত্রীমশাই ক্লান্তিতে আর ঘুমে বিছানায় ঢলে পড়লেন।

কিন্তু সে ঘুম আর ভাঙলো না।

প্রজারা এলো দরবারে। শোনে রাজবাড়ির হুহু কান্না, শুনে থমকে দাঁড়ায় তারা। তারপরই আনন্দে জয়ধ্বনি দেয়। জয় পঞ্চাশগ্রামের জয়, জয় পাঁচগ্রামের জয়!

কে একজন খবর দেয়, মন্ত্রীমশাই মারা গেছেন।

ওরা আবার জয়ধ্বনি করে।

খবর পান পাঁচগ্রামের রাজা। খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ঝিলমিলে নদী পেরিয়ে আসেন পঞ্চাশগ্রামে। দাঁড়ান গোঁফু রাজার মরা দেহটার সামনে।

চমকে ওঠেন রাজা।

এ যে সেই জামাটা রাজার গায়ে। কিন্তু এটা এমন মিশমিশে কালো কেন!

রাজা হাত দেন জামার ওপরে, রাজার গায়ে। তাঁর আঙ্গুলের ছোঁয়ায় জামাটা সাদা হয়ে ওঠে একটু।

আস্তে আস্তে জামাটা খুলে নেন রাজা পঞ্চাশগ্রামের রাজার গা থেকে। আর আস্তে আস্তে জামাটার কালো রঙ বদলে গিয়ে ফুটে ওঠে ধবধবে সাদা রঙ, ঠিক যেমনটি ছিল আগে।

আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে প্রজারা। জয়ধ্বনি করে ওঠে জোরগলায়। আর সেই শব্দে কান্না থেমে যায় রাজবাড়ির।

মরণের বেড়াজাল ঃ চিত্রে রোমাঞ্চকর কাহিনী (পূর্বানুবৃত্তি) **শ্রীতুষার চ্যাটার্জী**

খাঁচা খুলতে একজন এগোল হঠাৎ !!
দুম !!
বোমা !!
ওকি!
প্রচন্ড শব্দে কেঁপে ওঠে উপত্যকা
গিরিখাতে তরুন আবার বোমা ছোঁড়ে
এটা আরো শক্ত হবে
এদিকে প্রচন্ড যুদ্ধ চলেছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝে
হঠাৎ রূপাসিংএর আক্রমনে নিশীথ ঘোড়া থেকে পড়েগেল !
আঃ!

(চলবে)

সব্যসাচী

৮

রাত্রে সান্তালি ওষুধ লাগিয়েছিল কি গায়ে? কোনদিনই তা আর জানতে পারে নি টারজান।

কারণ পরদিন সকালে সান্তালিকে আর রাজবাড়িতে দেখতে পাওয়া যায় নি। শুধু রাজবাড়িতে কেন, গোটা ন্যান্দুর-উপত্যকার কোথাও সে নেই।

নেই বলে শুধু সান্তালিই যে নেই, তাও নয় আবার।

টারজান বজ্রাহতের মত বসে পড়ল খবরটা শুনে। কী সে খবর?

খবর এই যে শাব্‌রী নেই। ভোরে উঠে তারা গিয়েছিল রানীর ঘরে। গিয়ে দেখেছে রানীর শয্যায় শাব্‌রী নেই।

সান্তালি আসার পর থেকে সেই রানীর ঘরের মেজেতে শয়ন করত। টারজানের জন্য অন্য একটা ঘর পরিষ্কার করে দিয়েছে বালি।

সান্তালি নেই, শাব্‌রী নেই।

মূর্ছাহতের মত বসে ছিল টারজান। অনেকক্ষণ! অনেকক্ষণ! হঠাৎ একসময় সে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। সান্তালি পালাবে কী করে? চারিদিকে যে কড়া পাহারা রয়েছে! ঐরাবতের মত ন্যান্দুরেরা ঘিরে আছে উপত্যকাটা! কোথায় এমন ফাঁক পেলো সান্তালি যে তারই ভিতর দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল শাব্‌রীকে নিয়ে?

আর শাব্‌রী! শাব্‌রী! শাব্‌রী গেল? স্বয়ংবরা শাব্‌রী জন্মজন্মান্তরের স্বামীকে ছেড়ে গেল? কোন্ প্রাণে গেল? কী অভিমানে গেল?

হয়েছে! বুঝতে পেরেছে টারজান! অভিমানের কারণটা বুঝেছে। টারজান গজমতী রানীর জাদুশক্তিকে করেছে প্রত্যাখ্যান। অন্তরে ঘা লেগেছে গজমতীর। তাই পালিয়েছে শাব্‌রী। সে দেখতে চায় সামোসির কবল থেকে টারজান শুধু বাহুবলেই তাকে উদ্ধার করতে পারে কি না।

পারে যদি, সে ত গজমতীরও গৌরব। এই গৌরব যে তার স্বামী বাহুবলেই ইন্দ্রজালবিজয়ী। সেও দেখতে চায় সে বাহুবলের পরিচয়। ট্রয় যুদ্ধে তার স্বামীর অশেষ বীরত্বের গাথা মহাকাব্যে লেখা আছে। ইদানীংকালে তিন জন্ম ধরে গজমতী দেখে আসছে সে বীরত্বের অসামান্য প্রকাশ। প্রথম জন্মে ড্রাগন বিজয় দেখেছে টারজানের, দ্বিতীয়ে ইয়েটি বিজয়। এবার তৃতীয় জন্মে— ?

উন্দুগলু বিজয় ত বটেই, ঐন্দ্রজালিক সামোসির মায়াজাল ছেদন। টারজান নিজে বেছে নিয়েছে এই দায়িত্ব। নিজের শক্তির পরিধি কি সে জানে না ?

গজমতীর চিন্তাধারা হয়ত এইরকমই ছিল। অন্ততঃ টারজানের তাই অনুমান।

টারজান ছুটে বেরুল। ন্যুন্দুরেরা পাহারা দিচ্ছে। মাঠের মাঝে, পাহাড়ের পাশে পাশে। তাদের বেষ্টনী ভেদ করে মাছিটিরও পালানো অসম্ভব। তাহলে এ হল কী ব্যাপারখানা ?

জিজ্ঞাসাবাদ করে টারজান কিন্তু বুঝতে পারল শেষ পর্যন্ত যে সত্যি সত্যি কী হয়েছিল ব্যাপারখানা।

জেরায় পড়ে অনেক ন্যুন্দুরই একটা সত্য কথা প্রকাশ করে ফেলল। না করে কী করবে তারা ? তাদের মোটা মাথার ভিতরে মিথ্যা কথা বলবার মত কল্পনাশক্তি নেই। চক্ষুষ প্রত্যক্ষ-করা জিনিসই তারা গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারে না, তা আবার মিথ্যা বলবে কোথা থেকে ?

হাঁ, সত্য কথা যেটা তারা বলেছে, তা হল এই যে শেষরাত্রির দিকে তারা সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছে।

তা, ঘুমোলে কী হবে ? গায়ে গায়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তারা, একটা মানুষ বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা ছিল না কোথাও—

টারজান ধমকে ওঠে সেকথা শুনে—"তোমাদের কারও পেটের তলা দিয়ে যদি গিয়ে থাকে ?"

"এমন সাহস কার হবে ? সেই যাবুন সান্তালির ?"—অবিশ্বাসের মাথা-নাড়া ন্যুন্দুরদের দিক থেকে।

টারজান আর উত্তর দেয় না। সত্যিই সচেতন সান্তালির এমন সাহস হবে না।

কিন্তু অভিশাপের ভয়ে হতচেতন সান্তালির? গায়ের ক্ষত থেকে কসানি ঝরতে দেখেই সে হয়ত ধরে নিয়েছে যে ও-ক্ষত সামোসির জাদুর বলেই তার দেহে দেখা দিয়েছে। পচে গলে অশেষ কষ্ট পেয়ে মরার ভয় জ্ঞানবুদ্ধি লোপ করে দিয়েছে তার। তারই ফলে মেয়েকে বলি দেওয়ার চিন্তাও অসহ্য মনে হয় নি তার, অসম্ভব মনে হয় নি ন্যুন্দুরের পেটের তলা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া।

সান্তালির অদ্ভুত আচরণের একটা ব্যাখ্যা এভাবে বার করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এই হোঁৎকা ন্যুন্দুরগুলো একসাথে ঘুমিয়ে পড়ল কেন পাহারা দিতে এসে? এর কী ব্যাখ্যা করবে টারজান? অনিবার্যভাবেই কি জাদুশক্তির কথা মনে আসছে না? সামোসির তরফ থেকে?

জাদু?

ঐখানে দাঁড়িয়েই টারজান আগুন-চোখে টিলার দিকে তাকাল একবার। ওরই মাথায় গজমতী রানীর জাদুদণ্ড পাথরে পুতে রেখেছে টারজান। এই মুহূর্তে ওখানে গিয়ে সেই দণ্ড যদি সে তুলে নেয়, ঝড়ের বেগে এক্ষুণি গিয়ে পড়তে পারে কাব্রুকার উন্দুগলু-গুহায়। সামোসিকে তারই হাড়কাঠে বলি দিয়ে উন্দুগলুগুলোকে ছোরার ঘায়ে ঘায়ে জখম করে শাব্‌রীটাকে নিয়ে ফিরে আসতে পারে দুপুরের আগেই।

হাঁ, জাদুর সাহায্য নিলে টারজান এক্ষুণি তা পারে। গজমতী ভেবেছিল প্রয়োজন হবে সে-সাহায্য নেওয়ার। তাই হিমালয়শিখরে-হারানো জাদুদণ্ডকে সে মন্ত্রশক্তিতে আহ্বান করে ফিরিয়ে এনেছিল ন্যুন্দুর-উপত্যকায়।

কিন্তু টারজান প্রত্যাখ্যান করেছে জাদুকে।

এখন? সামোসির জাদুর বলে শাব্‌রী যখন অপহৃতা হল, টারজান কি ফিরিয়ে নেবে তার কথা? নিজের হাতে কান মলবে নিজের? বড় যে খেলো হয়ে যেতে হয় তাহলে! নিজের চোখেও বটে, গজমতীর চোখেও বটে! গজমতীর স্বামিগৌরবের মাথায় কি বজ্রাঘাত করা হবে না তাতে?

না, টারজান তা পারবে না। বড়াই করে বলেছিল বাহুবলে সে যে-কোন শত্রুর চক্রান্ত চূর্ণ করতে পারে। মৃত্যুপণ করে সেই প্রয়াসই তাকে করতে হবে এখন।

টারজান আর রাজবাড়িতে গেল না, গেল না টিলাতেও। ন্যুন্দুর সর্দারদের হুঁশিয়ার থাকতে বলে একাই উঠে পড়ল পাহাড়ের মাথায়।

ঐ সেই জাব্রাজি-উপত্যকা। ঐ যে সেদিনকার নিহত উন্দুগলুটার সমাধি। বেদীর উপরে পাথরের আচ্ছাদন ময়লা হয়েছে বটে, কিন্তু মসৃণ এখনো। ঐ বেদীতে বসে একটু বিশ্রাম করবে টারজান।

শেয়ালের পিছনে পিছনে টারজান চলেছে— [পৃষ্ঠা ৫৮৫

বিশ্রাম? না, দেহের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হয় নি এরই মধ্যে। প্রায় কখনোই হয় না সে প্রয়োজন। বসে একটু চিন্তা করা দরকার। শত্রুপুরীতে হানা দিতে হবে, একটা ভাল পরিকল্পনা চাই তার!

এইখান দিয়ে কাক্রুকা পৌঁছোবার রাস্তা শুরু হয়েছে। দিনের বেলায় সে-রাস্তা ধরে চলা টারজানের উচিত হবে না। পথের মাঝে না হোক, পথের শেষে চোখে পড়তেই হবে শত্রুপক্ষের। অন্য পথ যদি থাকে, যে-পথে বুনেরা চলাফেরা করে না সচরাচর—

হঠাৎ বেদীর পিঠে চোখ পড়ল টারজানের। দুটো শেয়াল উবু হয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। টারজান চিনল। রীকে নিয়ে যাওয়ার দিন এদেরই সে রাত্রিবেলায় দেখতে পেয়েছিল বেদীর উপরে। এরা পালাতে যাচ্ছিল, টারজানের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে পালানোর মতলব ত্যাগ করে—

টারজানই কথা কইল শৃগালভাষায়—"কেমন আছ বন্ধুরা?"

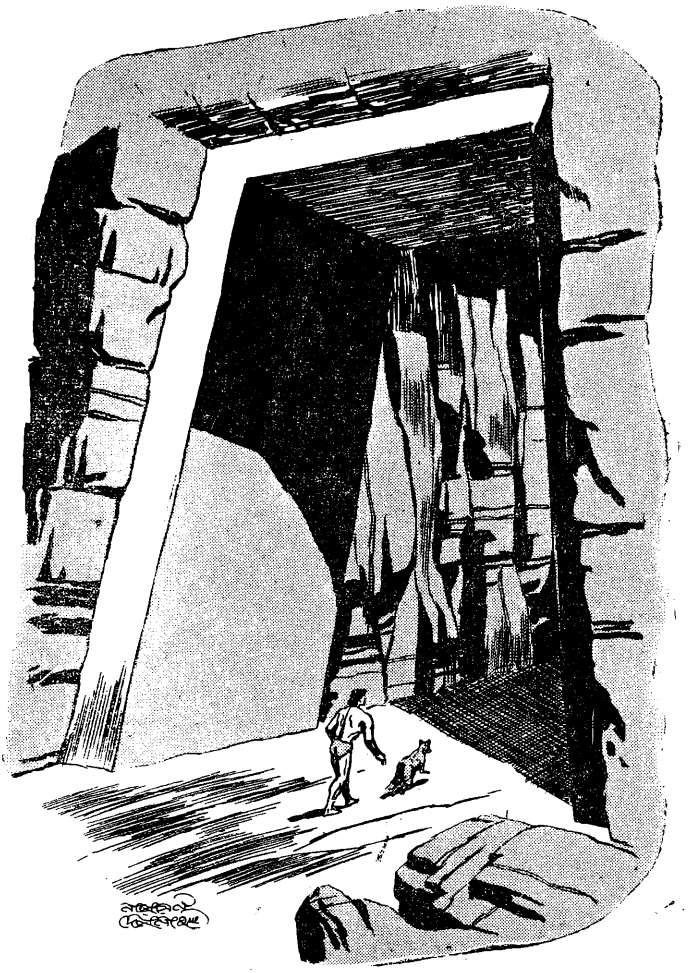

শৃগাল উত্তর দিল—"হুক্কা হুয়া—ভালই আছি রাজার দয়ায়। গোটা পাঁচেক বাচ্চা হয়েছে, এই গর্তে রেখেছি তাদের, ঠিক বেদীর গায়ে করেছি গর্তটা—হুয়া হুক্কা—"

শৃগালী যোগ দিল এই আলাপের ভিতর—"তুমি যে-বাচ্চাটিকে সেদিন নিয়ে গেলে রাজা, তাকে আবার আজই শেষরাতে দেখলাম যে! তুমি তাকে ফিরিয়ে দিলে বুঝি? আহা, বাচ্চাটার চোখে জল দেখলাম যেন—হুক্কা হুয়া—"

টারজানের বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল একথা শুনে। গজমতী কেঁদেছে তাকে ছেড়ে এসে। এ কী বোকামি সে করে বসল!

যা হোক, নিজেকে সংযত করল সে বহুকষ্টে। তারপর জিজ্ঞাসা করল—"কাব্রুকাতে নামবার আর কোন পথ নেই? ঐ সমুখের পথ ছাড়া?"

শৃগালী সোৎসাহে বলে উঠল—"হুক্কা হুয়া—পথ নেই আবার! চমৎকার পথ আছে। সমুখের এটা কি আবার পথ নাকি! আগেকার যাবুনেরা—হুক্কা হুয়া—এ-পথে চলত শুধু আপদে বিপদে। তাদের যাতায়াত ছিল যে-পথে, চারটে ছ'টা ধাড়ী উন্দুগলু তা দিয়ে পাশাপাশি চলতে পারত—হুক্কা হুয়া—"

টারজান কান খাড়া করে আছে—

শেয়াল এইবার তার গিন্নীকে থামিয়ে দিয়ে বলল—"হুক্কা হুয়া, তোর কি ধড়ে এতটুকু বুদ্ধি নেই? যে-পথে চলা সম্ভব নয়, সে-পথের হদিস রাজাকে বাতলে দিয়ে লাভ কী হবে? হুক্কা হুয়া—"

"কেন? কেন? চলা সম্ভব নয় কেন?"—ব্যস্ত হয়ে জানতে চায় টারজান।

"হুক্কা হুয়া—কেমন করে সম্ভব হবে? রাস্তা যখন সেকালের যাবুনেরা তৈরি করেছিল পাহাড় কেটে, তখন একটাও খাঁড়াদাঁতী বাঘ ছিল না এদেশে। কোথা থেকে যে—হুক্কা হুয়া—তারা এল—হাজারে হাজারে ইয়া-ইয়া খাঁড়াদাঁতী বাঘ—যাবুনদের খেয়ে শেষ করে ফেলল দেখতে দেখতে। শেষ পর্যন্ত—হুক্কা হুয়া—ও-পথে চলাই ছেড়ে দিল যাবুনেরা—হুক্কা হুয়া—"

টারজান শুনছিল আর ভাবছিল, এইবার জিজ্ঞাসা করল—"খাঁড়াদাঁতী বাঘ এখন আর নেই বোধ হয় ওপথে?"

"নেই! না থাকলে—হুক্কা হুয়া—একথা বলব কেন যে ও-পথে চলা সম্ভব নয়? এক হাজার যদি তখন এসে থাকে, এখন তাদের বংশ বেড়ে বেড়ে দশ হাজারে দাঁড়িয়েছে—হুক্কা হুয়া—"

"তুমি চলবে নাকি সে-পথে?"—ভয়ে বিস্ময়ে শেয়াল দম্পতি হুক্কা হুয়া জিগির ছাড়তে ভুলে গেল এবার।

"কেন চলব না বন্ধুরা? আমি যেমন তোমাদের রাজা, তেমনি রাজা বাঘেদেরও। আফ্রিকার কোন বনে এমন পথ নেই যেখানে বনের রাজা টারজানের প্রবেশ নিষেধ হতে পারে। তোমরা একজন যদি পথটা আমায় দেখিয়ে দিতে পার—"

বনের রাজা টারজান? হাঁ, এ-নাম ত শোনা আছে শেয়ালদের। জীব হিসাবে ছোট্ট হলে কি হয়, খোঁজখবর রাখে তারা। বনের রাজা টারজান যে শিষ্ট জন্তুর বন্ধু আর দুষ্ট জন্তুর দুশমন, সে কথা এদের ভালরকমই জানা।

"রাজার হুকুম না মেনে পারি?"—বলেই লাফিয়ে উঠল শেয়াল—"হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া—গিন্নি, তুই বাচ্চাদের তদ্বির কর ততক্ষণ, আমি যাই রাজাকে পথ দেখাতে—"

শেয়ালের পিছনে পিছনে টারজান চলেছে—দূর থেকে মনে হয়েছিল জাব্রাজি-উপত্যকার এই খোলামেলা মাঠখানা বুঝি চারদিকেই উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এখন কাছে আসতে আসতে চোখে পড়ল দুই-এক জায়গায় বেশ চওড়া দরোজা আছে সে পাথরের দেয়ালে। শাব্‌রীকে নিয়ে যাওয়ার দিন সে ঐসব পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়েই কাব্রুকা থেকে এসেছিল বটে। কিন্তু সে ছিল রাত্রিবেলার ব্যাপার। চাঁদের আলো যত পরিষ্কারই হোক, তাতে কখনও পাহাড়ের গায়ের ফাঁক চোখে পড়তে পারে না কারও।

এইরকমই একটা দরোজা দিয়ে টারজান ঢুকল শেয়ালের পিছনে পিছনে। দরোজা যেমন উঁচু, তেমনি দরাজ। দুটো ধাড়ী হ্যান্দুর অনায়াসে পাশাপাশি যেতে পারে। আর তার চেয়েও বড় কথা, পাথরের মেজে এখানে সমতল, চলতে ফিরতে আরামও খুব। এ যে অতীত যুগের কোন নিপুণ কারিগরের হাতে তৈরী, তার প্রচুর প্রমাণ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

শেয়াল এতক্ষণ খুব স্ফূর্তির সঙ্গেই এগিয়ে চলছিল, এইবার যেন সে একটু দ্বিধাগ্রস্ত। একটু একটু চলে, আর পিছন ফিরে তাকায়। টারজান মনে মনে হাসল। শেয়াল বাহাদুর ভয় পেয়েছেন! অর্থাৎ খাঁড়াদাঁতীদের রাজ্য নিকটেই।

অতএব সে মোলায়েম সুরে বলল—"ভাই শেয়াল, তুমি এইবার ফেরো। এলে ত অনেক দূর। পাঁচ পাঁচটা বাচ্চা ফেলে এসেছ গিন্নীর উপরে। হাজার হলেও সে ত মেয়েছেলে বই কিছু নয়! বন-পাহাড়ের বিপদ্-আপদ্ সামলানো তোমার আমার মত মরদবাচ্চারই কাজ। তুমি বরং রাস্তাটা আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরো।"

শেয়ালবন্ধু পরম আপ্যায়িত। স্বয়ং রাজা তাকে মরদবাচ্চা বলে স্বীকার করেছে, এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে? সমুখের বাঁ পা তুলে সে একবার গোঁফটা চুমরে নিল। ততক্ষণে ডান পা তুলে সে রাজাকে বোঝাচ্ছে—"জানলে রাজা—এই পথ বেয়ে সোজা চলে যাও। বেশ খানিকটা গেলে দেখবে পথ বাঁয়ে ঘুরেছে। ঘুরে একেবারে সোজা চলে গিয়েছে নাক-বরাবর। সেই পথের কথাই গিন্নী বলছিল—চারটে ছ'টা ধাড়ী উন্দুগলু—"

টারজান বাধা দিয়ে বলল—"সেই পথের উপরেই বুঝি এখন খাঁড়াদাঁতী বাঘেদের আস্তানা? বলে যাও এইবার—নাক-বরাবর গিয়ে তারপর কী করব?"

"হুক্কা হুয়া—মানে পায়ে পায়ে খাঁড়াদাঁতী বাধবে রাজা! কিন্তু রাজাকে ত আর

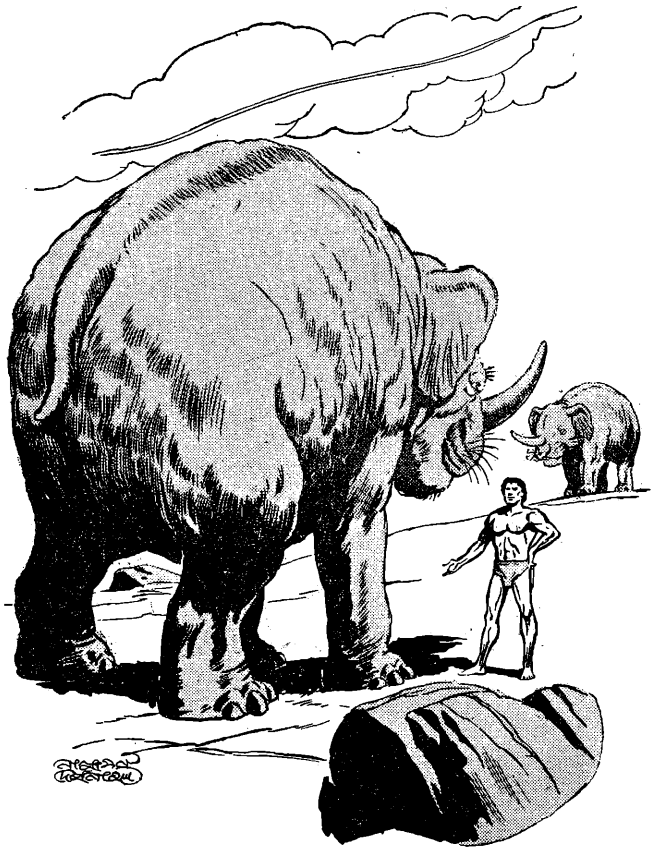

টারজানের চোখে পড়ল একটা অতিকায় খাঁড়াদাঁতী বাঘ,…

কেউ কিছু বলবে না! কক্ষণো বলবে না! জানোয়ারেরা মানুষের মত বজ্জাত নয়, রাজার মর্যাদা তারা বোঝে। তা তুমি নাক-বরাবর গিয়ে গিয়ে গিয়ে—"

"গিয়ে?"—উৎসুক প্রশ্ন টারজানের—

"আবার বাঁয়ে এইরকম একটা পথ পাবে পাহাড়ের বুকের ভিতর দিয়ে। সেই পথে ঢুকলেই একটু বাদেই নীচে দেখবে কাব্রুকা। ঠিক তোমার পায়ের তলায় উন্দুগলুদের গুহা পড়বে—"

টারজান সব বুঝে নিয়ে তারপর শেয়ালকে বলল—"তুমি এইবার যাও বন্ধু! তবে ফিরে গিয়েও তোমায় কাজ করতে হবে একটা। একটু এগিয়ে ন্যুন্দুর-উপত্যকার মাথার উপরে দাঁড়াবে। নীচে ন্যুন্দুর পল্টন রয়েছে, তাদের হেঁকে বলবে—'রাজা টারজান তোমাদের এই এই পথ দিয়ে এগুতে বলেছে'—কেমন পারবে ত?"

"কেন পারব না! হুক্কা হুয়া! বাচ্চাদের একবারটি দেখে নিয়েই আমি ন্যুন্দুরদের তলব করছি। তা বোঝে, ওরা আর কারও কথা না বুঝুক, শেয়ালের কথা ভালই বোঝে। চার যুগ ধরেই পাশাপাশি বাস করছি ত! আর হেন রাত্রি নেই সারা বছরে, যাতে শেয়ালের হুক্কা হুয়া ওরা না শোনে—"

রাজার পায়ে সাষ্টাঙ্গে একবার গড়াগড়ি দিয়ে উঠল শেয়াল বাহাদুর, আর তারপরই হুক্কা হুয়া রবে ছুটে চলল ঘরের পানে।

টারজান এগিয়ে চলল। একটু বাদেই সেই মোড়ে পৌঁছুল, যেখানে রাস্তা বাঁয়ে ঘুরেছে। প্রথম জিনিস এখানে যা চোখে পড়ল টারজানের, তা হল একটা অতিকায় খাঁড়াদাঁতী বাঘ, তার বাঁদিকের খাঁড়াখানা মাঝামাঝি ভাঙা। (চলবে)

মিঃ ডেভেনপোর্ট ও মিঃ এ. সি. সরকার

লণ্ডনে দেখানো আমার এক ম্যাজিক

জাদুকর এ. সি. সরকার

ভেবেছিলাম বিকেলের দিকে বরফ পড়া বন্ধ হবে, একটু আলোর হাসি ফুটবে আকাশের ঠোঁটে—কিন্তু তা হলো না। বরং দুপুর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সাথে জোট বেঁধে শুরু হলো ঝোড়ো বাতাসের দাপাদাপি। এদেশে হলে এটাকে মহা-দুর্যোগ বলা চলতো কিন্তু বিলাতের ব্যাপারই আলাদা। ওখানে শীতকালের এ এক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। শীতের ক'মাস সূর্যিঠাকুরের সাক্ষাৎ পাওয়া এক মহা ভাগ্যের কথা। আর বরফ পড়া—সে তো রুটিনবাঁধা ব্যাপার।

লণ্ডনের আবহাওয়ার সঙ্গে প্রথম যখন পরিচয় হলো তখন তো আর এসব জানা ছিল না তাই হতাশ হলাম মনে মনে। এত করে সারাদিন খেটে একটা মজাদার নতুন জাদুর খেলা তৈরি করলাম সন্ধ্যাবেলায় এক বিশেষ শিশু-মজলিসে দেখাবো বলে, এই দুর্যোগের জন্য সব ভণ্ডুল না হয়ে যায়। যিনি আমাকে অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবেন সেই মিঃ ডেভেনপোর্ট এখন এলে হয়! এই দুর্যোগের মধ্যে তিনি বেরুবেন কি ঘর থেকে! চিন্তায় কাঁপতে কাঁপতে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে ভাবছিলাম আবোল-তাবোল আর ঘনঘন তাকাচ্ছিলাম হাতঘড়ির দিকে।

ক্রিং ক্রিং···ঘরের কোণের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। পরিচারিকা উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরে পরক্ষণেই আমাকে ডাকলো, "মিঃ এ. সি. সরকার, আপনার ফোন।"

ফোন ধরতেই ওপার থেকে ভেসে এলো মিঃ ডেভেনপোর্টের কণ্ঠস্বর ঃ "মিঃ সরকার, আপনি রেডি তো? আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছচ্ছি আপনার হোটেলে।"

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় মিঃ ডেভেনপোর্ট এসে হাজির হলেন আমার হোটেলে। তাঁর সঙ্গে গিয়ে উঠলাম ট্যাক্সিতে। অনুষ্ঠানের জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম ঠিক ছটায়।

ছোটমতন একটা স্টেজ করা হয়েছিল একটা লম্বা হলঘরের এক প্রান্তে। সামনের পর্দাটা একটু ফাঁক করে স্টেজের সামনে এগিয়ে গিয়ে মিঃ ডেভেনপোর্ট কচি-কাচা দর্শকদের কাছে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন,—

"বন্ধুগণ, আজকে তোমাদের সঙ্গে যাঁর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তিনি হচ্ছেন একজন বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় জাদুকর। সম্প্রতি এঁর কাছ থেকে একটা নতুন ধরনের জাদুর কৌশল আমি কিনে নিয়েছি। ইনিই প্রথম ভারতীয় জাদুকর যাঁর কাছ থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠান কোনও জাদুর কৌশল কিনলো। এঁর অনেক বিশেষ বিশেষ ধরনের মজাদার জাদুর খেলা আছে। তার থেকে কয়েকটা ছোট ছোট খেলা আজ তোমাদের ইনি দেখাবেন। এঁর বিশেষ একটি কৃতিত্ব কণ্ঠগীটারের বাজনা। তাও তিনি তোমাদের শোনাবেন। সবশেষে ইনি তোমাদের শিখিয়ে দেবেন এঁর আবিষ্কৃত একটি সহজ জাদুর কৌশল।"

পরিচয় দিয়ে মিঃ ডেভেনপোর্ট সরে যেতেই সামনের পর্দা ধীরে ধীরে সরে গেল। ভারতীয় পোশাক সিরোয়ানী ও টুপি পরা অবস্থায় আমি মঞ্চে প্রবেশ করে অভিবাদন জানালাম ক্ষুদে দর্শকদের। করতালিতে মুখর হলো প্রেক্ষাগৃহ।

আধঘণ্টা ধরে একটা একটা করে পাঁচটা মজাদার ম্যাজিক দেখিয়ে দর্শকদের মনে ধরিয়ে দিলাম বিস্ময়ের ঘোর। এর পরে তাদের বিস্ময়ের জগৎ থেকে সুরের মায়ামহলে ফিরিয়ে আনার জন্য আরম্ভ করলাম আমার কণ্ঠগীটারের অনুষ্ঠান। কণ্ঠ-গীটারের সুরমূর্ছনায় তুললাম বিলাতী সুর 'ওভার দি ওয়েভস্'—সুরের ছন্দে ছন্দে দুলতে লাগলো দর্শকদের মাথা। বাজনা থামলো, কয়েক সেকেণ্ডের নিস্তব্ধতার পরে করতালির ঐক্যরবে কেঁপে উঠলো চারদিক।

এবার পূর্বঘোষিত জাদুর খেলা দেখানোর পালা। প্রথমে ওদের সামনে একবার খেলাটা করে দেখানো দরকার। পাকা প্রদর্শকের মতই আমি খেলাটা একবার করলাম ওদের সামনে।

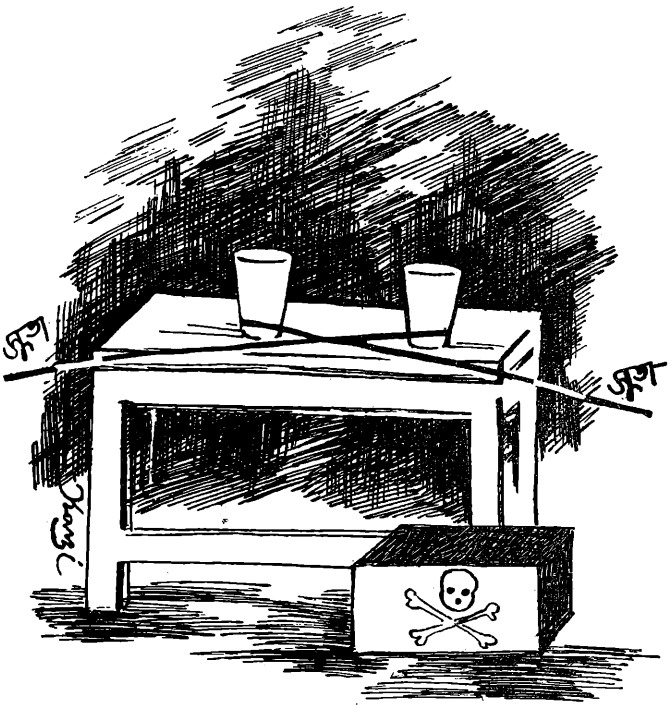

টেবিলের উপরে আছে দুটো কাচের গ্লাস—

স্টেজের মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। সেই টেবিলের উপরে আছে দুটো কাচের গ্লাস—একটা লাল আর একটা নীল। স্টেজের একপাশে পড়ে আছে একটা চৌকো মতন কাগজের বাক্স। বাক্সটার আকার এমন যাতে এ দিয়ে দুটো গ্লাসকেই একসঙ্গে চাপা দেওয়া যায়।

আমি এই কাচের গ্লাসদুটোর দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, "বন্ধুগণ, এই যে দুটো গ্লাস এরা কিন্তু খুব সহজেই সজীব হয়ে উঠতে পারে মন্ত্রের প্রভাবে। মন্ত্রের প্রভাবে এরা চলতে পারে এখান থেকে ওখানে। বিশ্বাস না হয় পরখ করেই দেখা যাক।"

কথা শেষ করে আমি কাগজের বাক্সটা দিয়ে ঢাকা দিলাম গ্লাসদুটোকে। লাল গ্লাসটা থাকলো স্টেজের বাঁদিকে আর নীল গ্লাসটা থাকলো স্টেজের ডানদিকে। এইভাবে রেখে ম্যাজিকের মন্ত্র পড়লাম ঃ

চাল ফলে না চালতে গাছে,
ধানবাদেতে ধান,

পাটের আবাদ পাটনাতে নাই,
জাপানেতে পান।
হিংচে গাছে হিং ধরে না,
শিমলাতে নাই শিম।
এ কথা ঠিক, হিমালয়ে
গেলেই পাবে হিম!

মন্ত্র পড়ে ঢাকনাটা তুলে ধরলাম। সকলে অবাক্ হয়ে দেখলো মন্ত্রের প্রভাবে নীল গ্লাস আর লাল গ্লাস পরস্পর স্থান পরিবর্তন করেছে। করতালির কলরোল উঠতেই হাত তুলে ইশারা করে ওদের থামিয়ে দিলাম। আমার নির্দেশে স্টেজের আলোগুলো আরো জোরালো করা হলো। দর্শকদের দুজনকে স্টেজে তুলে এনে ওদের নিয়ে গেলাম টেবিলের একেবারে কাছে। ওরা টেবিলের কাছে যেতেই এই মজাদার গ্লাসের রহস্য ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওরা স্পষ্ট দেখতে পেলো যে গ্লাসদুটোর গায়ে বাঁধা রয়েছে দুটো লম্বা কালো সুতো। লাল গ্লাসের সঙ্গে বাঁধা সুতোটা শেষ হয়েছে স্টেজের ডান-দিককার উইংস্এর ভেতরে। সেখানে একজন এই সুতোর প্রান্তটা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। নীল গ্লাসের সঙ্গে বাঁধা সুতোটার প্রান্ত ধরে আর একজন দাঁড়িয়ে আছেন বাঁদিকের উইংস্এর ভেতরে। সুতো বাঁধা আছে গ্লাসের একেবারে তলা ঘেঁষে।

ওদের চোখের সামনে খেলাটা আবার করে দেখাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। সুতোবাঁধা অবস্থাতেই গ্লাসদুটোকে সরিয়ে রাখলাম আগের মতন, তারপরে বাক্স দিয়ে ঢাকা দিয়ে ইঙ্গিত করলাম। ইঙ্গিত করামাত্র উইংসের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুজন আস্তে আস্তে সুতো টানলেন। সুতোর টানে গ্লাসদুটো স্থান পরিবর্তন করলো।

কচিকাচার দল খুব খুশী হলো এই মজাদার কৌশলটা শিখতে পেয়ে। এদের অনেকেই সাফল্যের সঙ্গে এই খেলাটা দেখিয়ে বাড়ির লোকদের অবাক্ করে দিয়েছিল। এর পরদিন থেকেই ডেভেনপোর্টের জাদু সরঞ্জামের দোকানে ম্যাজিক দেখানোর কালো সুতোর চাহিদা রাতারাতি বেড়ে গিয়েছিল। একটা কথা এই সূত্রে বলে রাখা দরকার। ডেভেনপোর্ট অ্যাণ্ড কোম্পানি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো আর সবচেয়ে বড় জাদুবিদ্যার যন্ত্রপাতি আর কৌশলের কেনাবেচার প্রতিষ্ঠান। ওদের ওখান থেকে অর্থাৎ খাস লণ্ডন থেকে ম্যাজিকের কালো সুতো আনানো তো আর তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তোমরা বাজার থেকে সরু অথচ শক্ত কালো সুতোর কাটিম কিনে নিও। খেলা দেখানোর সময়ে আলোর তেজ কমিয়ে দিও আর পেছনে কালো বা ঘননীল পর্দা ব্যবহার করো।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমাকে স্বপ্ন দেখেছে ?

হ্যাঁ, তোমাকে ধরে নিয়ে আসার ক'দিন আগে বাশুলীদেবী বলেছেন, কালু, ঘটনাচক্রে যে আসবে তাকে যত্ন করবি। সে সাধারণ মানুষ নয়। সে এলে তোর দল অজেয় হয়ে উঠবে। তোর প্রতিপত্তি বাড়বে। তারপরই তুমি এলে।

তারা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

এরপর থেকে তারার দৈনিক জীবনযাত্রা একেবারে এক নিয়মে চলল। ভোরবেলা উঠে ছোলাভিজানো খেয়ে লাঠি আর ছোরা খেলা শেখা। বিশ্রাম করে শরবত আর অন্য কিছু খেয়ে নিয়ে সর্দারের কাছে তীর ছোঁড়া শেখা। তা ছাড়া সাঁতার, গাছে চড়া, দৌড়ানো তো আছেই।

কালু বলে, আমাদের সব কিছু শিখে রাখতে হয় মা। কখন কি অবস্থায় পড়ি কিছুই ঠিক নেই।

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম। বিকালে রঘুর কাছে কুস্তি, ঘোড়ায় চড়া শেখা।

এ ছাড়াও অনেক কিছু করতে হয়।

একদিন অসময়ে কালু ডেকে পাঠাল। সবে তারা ঘুম থেকে উঠে কুস্তি শিখতে যাবার জোগাড় করছে, অনুচর এসে দাঁড়াল।

মা, সর্দার ডাকছে।

আমাকে ?

হ্যাঁ, সর্দার বদনতলার মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তারা বেরিয়ে পড়ল। অনুচর সঙ্গে সঙ্গে চলল।

বদনতলার মাঠ বাশুলীর মন্দিরের ঠিক পিছনে। এখানেই তারা দৌড়ানো অভ্যাস করে। সেখানে পৌঁছে তারা দেখল একটা মাটির ঢিপির ওপর কালু বসে আছে।

তারাকে দেখে বলল, এস মা, এখানে বস।

তারা সর্দারের পাশে গিয়ে বসল।

কোথাও কিছু নেই। মাঠ খালি। এখানে চুপচাপ কেন বসে থাকতে হবে তারা বুঝতে পারল না।

হঠাৎ একটা শেয়ালের চীৎকারে তারা চমকে উঠল।

চেয়ে দেখল দুজন লোক একটা শেয়ালের গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

ঠিক সর্দার আর তারার সামনে শেয়ালটাকে নিয়ে এসে একটা বাঁশের খুঁটিতে বাঁধল। একজন অনুচর শালপাতায় একটা মাংসের টুকরো এনে তারার সামনে ধরল।

নাও, এটা শেয়ালটাকে দিয়ে দাও। খুব কাছে যেও না। শেয়ালটা ক্ষেপে আছে।

খুব সাবধানে এগিয়ে তারা মাংসটা শেয়ালটার সামনে ছুঁড়ে দিল।

শেয়ালটা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তারপর আর লোভ সামলাতে না পেরে একটু একটু করে মাংসের সামনে এগিয়ে গেল। এদিক ওদিক দেখল, মাংসটা শুঁকল, তারপর একগ্রাসে মাংসটা মুখে পুরে দিল।

মিনিট পাঁচেক, তারপরই আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠল। ল্যাজটা গুটিয়ে পেটের মধ্যে চলে গেল। চারটে পা প্রসারিত করে মাটি আঁচড়াতে লাগল। জিভটা একদিকে ঝুলে পড়ল। দুঃসহ একটা যন্ত্রণায় শরীরটা কুঁকড়ে গেল। সমানে কাতর চীৎকার করতে লাগল।

শেয়ালটা অমন করছে কেন ?

তারা কালুকে জিজ্ঞাসা করল।

কালু কোন উত্তর দিল না। হাত দিয়ে তারাকে থামিয়ে দিল। একটু পরে শুধু বলল, দেখ না মজা।

প্রায় মিনিট কুড়ি আর্তনাদ করতে করতে শেয়ালটা একসময়ে স্থির হয়ে গেল। চার

পা ছড়িয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল। গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। দুটি চোখ বিস্ফারিত।

এইবার কালু উঠে দাঁড়াল।

তারাকে বলল, শেয়ালটাকে মাংসের সঙ্গে সেঁকো বিষ দেওয়া হয়েছিল। মানুষ হলে পাঁচ মিনিটেই সাবাড় হয়ে যেত, কিন্তু শেয়ালের কড়া জান অনেকক্ষণ লড়েছে।

কিছু বুঝতে পারল না তারা। হঠাৎ এভাবে শেয়ালটাকে বিষ দিয়েই বা মারা হল কেন? আর শেয়ালের মৃত্যু দেখবার জন্য তাকেই বা ডেকে আনল কেন কালু সর্দার?

তোমার তো এখন কুস্তি শেখার সময়, তাই না মা?

হ্যাঁ। তারা মাথা নাড়ল।

যাও তাহলে। রঘু অপেক্ষা করছে।

তারা চেয়ে দেখল একটু দূরে একটা তেঁতুলগাছের তলায় রঘু অপেক্ষা করছে।

কুস্তি শেখা শেষ হলে সন্ধ্যার ঝোঁকে তারা রঘুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করল। বিষ দিয়ে শেয়াল মারার কথা।

গামছা ঘষে ঘষে রঘু শরীর থেকে মাটি তুলছিল, তারার দিকে চেয়ে বলল, ডাকাতের দলে থাকতে হলে মনকে লোহার মতন কঠিন করতে হয় মা। অনেক রকমের যন্ত্রণাকর মৃত্যু আমাদের দেখতে হয়। অনেক সময় এমনও হয়, নিজের দলের লোককে আধমরা অবস্থায় ফেলে আমাদের পালিয়ে আসতে হয়। তাকে তুলে আনবার সুযোগ হয় না। এমনও হয়, বল্লমের খোঁচায় দলের একটা লোক যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তাকে সরিয়ে আনতে পারছি না, কিন্তু তাকে যদি কোম্পানির লোক ধরে নিয়ে যায় তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের দলের কথা, আস্তানার কথা জেনে নেবে, তাই পালাবার সময় আমরাই বর্শা দিয়ে কিংবা লাঠির ঘায়ে তাকে খতম করে দিয়ে আসি। যাতে সে আর কথা বলতে না পারে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে তারা উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল।

একটু পরে বলল, কি নিষ্ঠুর তোমরা!

আমরা কিছুই করি না। বাশুলীমাই আমাদের হাত দিয়ে সব কিছু করান। জন্ম মৃত্যু সবই তো মায়ের খেলা। আমরা নিমিত্ত মাত্র। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই সর্দার ওভাবে তোমার সামনে শেয়ালটাকে বিষ দিয়ে মারল।

তারা আর কোন কথা বলল না। সে জানে কথা বলে কোন লাভ নেই। তার ফিরে যাবার পথ যখন বন্ধ, তখন এদের মধ্যেই তাকে থাকতে হবে। এদের কথাতেই সায় দিতে হবে।

মাসের পর মাস ঘুরে বছরও শেষ হয়ে গেল।

লাঠি আর ছোরা খেলায় তারা অসম্ভব উন্নতি করেছে। তীর ধনুকে তার অব্যর্থ লক্ষ্য। ডাকাতদের জীবনের সঙ্গে তার জীবন অনেকটা মিশে গিয়েছে। কালু সর্দার যখন দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে বের হত, তখন ঘোড়ায় চড়ে তাদের সঙ্গে তারা বনের শেষ পর্যন্ত যেত।

মাঝে মাঝে কালু সর্দারের কাছে আবদারও করত।

ছেলে, আমায় কবে নিয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে ?

কালু হাসত।

নিয়ে যাব মা, সময় হলে ঠিকই নিয়ে যাব।

তারা অভিমান করত।

কেন, আমি তোমার দলের লোকের চেয়ে কিসে কম ? আজকাল তো বন্দুক ছোঁড়াও শিখেছি।

কালু বলত, তুমি কারো চেয়ে কম নয় মা। কম কেন হবে, তুমি যে সকলের মা। তোমার বয়সটা আর একটু বাড়ুক, মা আর ছেলে পাশাপাশি বের হব।

সারা দলে বন্দুক মাত্র তিনটে। গাদা বন্দুক। কোম্পানির সিপাইয়ের কাছ থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

কালু নিজের হাতে তারাকে বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়েছিল।

প্রথম দিন তো বন্দুকের ধাক্কায় তারা চিৎপাত হয়ে পড়েই গিয়েছিল ঘাসের ওপর।

তারপর আস্তে আস্তে তারা বন্দুক ছোঁড়া শিখে নিয়েছিল। প্রথম প্রথম শেয়াল, গাছে ঝুলন্ত সাপ, তারপর উড়ন্ত বক এক গুলিতে খতম করে দিত।

কালু হাততালি দিয়ে বলত, সাবাস, মা, সাবাস !

প্রথম যেদিন কালু তারাকে সঙ্গে নিল, তখন তারার বয়স তেরো।

সারারাত তারা ঘুমাতে পারে নি। বিছানায় ছটফট করেছে। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।

ঠিক সন্ধ্যা হতেই সবাই বেরিয়ে পড়ল। শাড়িটা তারা পুরুষদের মতন মালকোঁচা দিয়ে পরে নিল। মাথায় পাগড়ি বাঁধল, যাতে দরকারের সময় চুল খুলে মুখ চোখ ঢেকে বিব্রত না করে। কোমরে বড় ছোরা, হাতে বর্শা।

তারাকে মাঝখানে রেখে দলটা এগিয়ে গেল।

অনেকটা পথ। অনেকবার অন্ধকারে তারা গাছের শিকড়ে হোঁচট খেল। তারপর কালুর নির্দেশে একটা ঝাঁকড়া অশথগাছতলায় সবাই দাঁড়াল।

চকমকি জ্বেলে একজন আলো জ্বালাল। সেই আলোতে তারা দেখল এক পুরোহিত দাঁড়িয়ে।

পুরোহিত তারাকে বলল, আমি যা বলছি, সেই কথাগুলো উচ্চারণ কর মা। যদি কোনভাবে ধরা পড়ি তাহলে যতই দৈহিক যন্ত্রণা দিক শত্রুরা কিংবা অর্থে বশীভূত করার চেষ্টা করুক, আমি প্রাণান্তেও দলের কারো নাম বলব না, কোন আস্তানার খবর দেব না। মা বাশুলীর দিব্যি।

পুরোহিত চকচকে একটা হাঁড়া তারার কাঁধের ওপর রাখল।

তারা পুরোহিতের কথাগুলো উচ্চারণ করল। তারপর পুরোহিত সিঁদুর নিয়ে তারার কপালে টিপ এঁকে দিল।

কালু বলল, এবার পুরুতমশাইয়ের পায়ের ধুলো নাও মা।

মশালধারী দুজন তীরের ঘায়ে খতম। [পৃষ্ঠা ৫৯৬

তারা হাঁটু মুড়ে বসে পুরোহিতের পদধূলি নিল।

সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য কাঁপিয়ে গর্জন উঠল।

বাশুলী মায়ীকি জয়!

আবার যাত্রা শুরু হল।

ছোট ছোট জলা, বাঁশঝাড় পার হয়ে সবাই একটু ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছাল। আকাশে চাঁদের ফালি। খুব অল্প আলো। পরিষ্কার কিছু দেখবার উপায় নেই।

কালু বলল, সব গাছে উঠে পড়। আমি তলায় রইলাম। সময় হলে খবর দেব।

অন্য সকলের সঙ্গে তারাও গাছে চড়ল। অনেক ডালপালাছড়ানো বটগাছ। উঠতে কোন অসুবিধা হল না।

একটা মোটা ডাল আঁকড়ে তারা চুপচাপ বসে রইল। এই প্রথম টের পেল তার

বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় চলেছে। দুপ দুপ শব্দ। এতদিন যা শিখেছে, আজ হাতে-কলমে তার পরীক্ষা।

একটু বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল তারার। হঠাৎ চাপা গম্ভীর গলায় কালু সর্দারের সাবধানবাণী 'হুঁশিয়ার' কানে যেতেই সে সোজা হয়ে বসল।

অনেক দূর থেকে ঘুঙুরের মতন একটা শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

ঝুন, ঝুন, ঝুন।

ম্লান অন্ধকারে তারা দেখল অনুচরেরা সবাই গুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে। তারপর একে একে মাটিতে বুক দিয়ে সবাই শুয়ে পড়ল।

পশ্চিম দিক থেকেই ঘুঙুরের আওয়াজটা আসছিল। সেই দিকটাই আলো হয়ে উঠল।

মশালের আলো।

গাছের ওপর থেকে তারা এবার স্পষ্ট দেখতে পেল। দুটো লোক ছুটে আসছে। এক হাতে লাঠি, লাঠিতে ঘুঙুর বাঁধা, আর এক হাতে জ্বলন্ত মশাল।

তার পিছনেই একজন অশ্বারোহী সিপাই। তারপর বাহকরা পালকি বয়ে আনছে। বন কাঁপিয়ে বাহকদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হুম্ না, হুম্ না, হুহুম্ না।

পিছনে আরো অনেকগুলো পাইক।

বন্যজন্তু তাড়াবার জন্য ওই মশালের আলো আর ঘুঙুরের শব্দ। কুখ্যাত এই দুর্গাপুরের জঙ্গলের কথা তাদের জানা, তাই যতটা সম্ভব দ্রুতপায়ে জায়গাটা পার হবার চেষ্টা করছে।

বাশুলী মায়ীকি জয়! কালুর ভয়াল কণ্ঠস্বর। তারপর তার অনুচরদের হুংকার শোনা গেল। মাটি ফুঁড়ে যেন ছায়ামূর্তির আবির্ভাব।

কে একজন সবেগে সড়কি চালাল ঘোড়ার পায়ে। ঘোড়াটা পা মুড়ে বসে পড়ল, তার পিঠের লোকটা ছিটকে পড়ল জলার ওপর। মশালধারী দুজন তীরের ঘায়ে খতম।

সঙ্গে সঙ্গে পালকির পিছন থেকে লাঠিয়ালের দল ছুটে এসে পালকিটা ঘিরে রাখল।

লাঠির ফটাফট শব্দ, তীরের শোঁ শোঁ আওয়াজ, মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণার কাতরোক্তিতে মুহূর্তে জায়গাটা যেন নরকে পরিণত হল।

হঠাৎ দিগন্ত কাঁপিয়ে গুড়ুম গুড়ুম শব্দ।

সিপাইরা বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করেছে।

ডাকাতদের দু একজনও মশাল জ্বালিয়েছে।

সেই মশালের আলোয় তারা দেখল, শুধু সিপাইরাই নয়, পালকি থেকে একজন লালমুখো সায়েব বেরিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে বন্দুক ছুঁড়ছে। লাঠিয়ালরা তাকে ঘিরে রয়েছে।

ডাকাতদের তরফে বন্দুক মোটে তিনটি। তারা জানে দুটি আনা হয়েছে। একটি মেরামতের অপেক্ষায় আস্তানায় পড়ে আছে।

বন্দুকে সুবিধা যেমন আছে, অসুবিধাও কম নয়।

দূর থেকে লক্ষ্য করা যায় সত্য কথা, কিন্তু একবার গুলি ছোঁড়া হয়ে গেলেই আবার বারুদ ঠাসতে হয়। তাতে অনেক সময় নেয়। মুখোমুখি লড়াই করার পক্ষে খুব মুশকিল। বারুদ ঠাসবার সময় প্রতিপক্ষ আঘাত করার সুযোগ পায়। লাঠিয়ালরা লালমুখো সায়েবকে বেষ্টন করে রেখে তাকে বারুদ ভরবার সুযোগ দিচ্ছে।

মনে হল ডাকাতদের কয়েকজন বন্দুকের গুলিতে যেন ঘায়েল হল। আর্তকণ্ঠ শোনা গেল। একজন তো তারা যে গাছের ডালে বসে ছিল, তার তলাতেই উপুড় হয়ে পড়ল। দু একবার কেঁপে উঠেই নিস্পন্দ হয়ে গেল।

খুব বেগতিক অবস্থা। ডাকাতরা কিছুটা পিছিয়ে এল।

আচমকা লাঠিয়ালদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা শুরু হল।

হইচই চীৎকার। দু একজন পড়েও গেল মাটির ওপর।

ডাকাতরা পিছন থেকে তাদের আক্রমণ করেছে।

বাশুলী মায়ীকি জয়!

তারা বুঝতে পারল কালু সর্দারের গলার আওয়াজ।

কালু কিছু অনুচর নিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের পিছন থেকে আক্রমণ করেছে।

কালুর গলায় সাহস পেয়ে ডাকাতরা যারা পিছিয়ে এসেছিল, তারাও নতুন বিক্রমে লাঠিয়ালদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অসহ্য চীৎকার, গোঙানির শব্দ, মাথার খুলি ফাটার ফটাস ফটাস আওয়াজ।

আচমকা তারা দেখল লালমুখো সায়েবটা ছুটতে ছুটতে গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে তাকে বোধ হয় কেউ লক্ষ্য করে নি।

সায়েব কিন্তু পালিয়ে গেল না। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ডাকাতদের দিকে বন্দুকের নলটা ফিরিয়ে তাক করতে লাগল।

দু এক মুহূর্ত। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল তারা নিজেই বুঝতে পারল না। হাতের বল্লমটা সজোরে তুলে তারা সায়েবের পিঠ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। বল্লমটা সায়েবের পিঠে অনেকটা গিঁথে গেল।

মর্মান্তিক আর্তনাদ করে সায়েব পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে তাজা রক্তের স্রোত তারার শরীর, কাপড় ভিজিয়ে দিল। [ক্রমশঃ]

"৺শ্রীশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

ছেলেটা

শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মনোজ পড়ছিল।

চটিটা ছিঁড়ে গেছে। সারাতে হবে। তাই সেটাকে কোনরকমে পায়ে গলিয়ে এসে পৌঁছুলুম চৌমাথার ওপরে। মুচীর অভাব এখানে নেই। যে লোকটার কাছে সারাই সে আজ আসেনি। আর তার জায়গায় এসে বসেছে আমারই বয়সের একটা ছেলে। একটা জুতো পালিশ করছে একমনে। তার কাছেই এগিয়ে গেলুম, বললুম—ছাখ তো এটা।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা মুখ তুলল। তারপর চটিটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। আমি চটিটার ছেঁড়া জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললুম—কত লাগবে?

কোন কথা না বলে ছেলেটা চটিটা জলে ডুবিয়ে চামড়াটা নরম করতে লাগল একমনে, যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি। আবার বললুম—কত দিতে হবে?

এবার ছেলেটা কথা বলল—কুড়ি পয়সা দিবেন বাবু।

—কুড়ি পয়সা! বিস্ময়ের ভান করে বললুম—এখানে যে বসে সে হলে পাঁচ সাত পয়সা নিত। তোকে নাহয় দশ পয়সাই দেব, হবে? একটু পরে এসে নিয়ে যাব।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বোর্ডিংএর উদ্দেশে পা বাড়ালুম যাতে ছেলেটা আর দাম বাড়াবার সুযোগ না পায়। কিন্তু ছেলেটা কোন কথা বললে না।

বোর্ডিংএ এসে মনোজের ঘরে ঢুকলুম। আজ রবিবার। মনোজ পড়ছিল। আমাকে দেখে মনোজ বলল—এটা খুব important, করেছিস? মোহনবাবু বলেছেন এটা আসতে পারে।

Importantএর কথা শুনে কেই বা স্থির থাকতে পারে! তাই আগ্রহ বাড়ল। তাছাড়া মোহনবাবু যখন বলেছেন তখন আসতে পারে নয়, এসেছে। তাই দেখতে হল জিনিসটা কি। গলাটা বাড়িয়ে দেখলুম বড় বড় হরপে লেখা—"পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য"। বুঝলুম—রচনা। মনে মনে ভাবলুম এটা লেখা আর এমন শক্ত কাজ কি!

মনোজ কিন্তু পড়েই চলেছে—

"সংসারে পিতামাতার ন্যায় পূজনীয় ও হিতৈষী আর কেহ নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা।' অর্থাৎ পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যার ফল। পিতাকে সুখী করিতে পারিলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট থাকেন।"

এতটা পড়ে মনোজ আমার দিকে চাইল। হাঁপ ছেড়ে বলল—এটা লিখলে কেমন নম্বর পাব বল দেখি ?

কে কত নম্বর দেবে তা নিয়ে আলোচনা না করে পালটা প্রশ্ন করলুম তাকে—বইটা কার লেখা ?

পাতাটা উলটে দেখে নিয়ে মনোজ নাম বলল।

বললুম—দিবি একবার বইটা ?

মনোজ উদ্দেশ্য বুঝল, বলল—আমি আগে মুখস্থ করি, তারপর তুই নিস। বিকেলে এসে নিয়ে যাবি। আমি এক্ষুণি মুখস্থ করে ফেলব।

অগত্যা তাই। মনে মনে ঠিক করলুম বিকেলে একবার আসতেই হবে। Half-yearly পরীক্ষার আর পনের দিন বাকী। মুখস্থ এর মধ্যে করতেই হবে। মনোজের কাছ থেকে উঠে চৌমাথায় এলুম, বললুম—কই ? হল ?

—এই যে—

—এখনও ঐটে নিয়েই পড়ে আছিস ?

—হয়ে গেছে। বলে জুতোটা রেখে দিয়ে আমার চটিটায় হাত দিল। সেলাই করতে করতে বার বার হাতটা পিছলে যাচ্ছিল। কোনরকমে দুটো সেলাই দিয়ে দুটো পেরেক এঁটে দিল।

দশ পয়সা দিয়ে পায়ে গলিয়ে আসতে আসতে মাঝপথে চটিটা আবার সেই জায়গাতেই ছিঁড়ল। মনটা বিগড়ে গেল। মনে মনে বিরক্তি এল ছেলেটার উপরে। কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না, বেলা বেশ হয়েছে, তাই বাধ্য হয়ে পা ঘষতে ঘষতে বাড়ি ফিরে এলুম।

দুপুরে ঘুমিয়ে যখন উঠলুম তখন চারটে বাজছে। অতএব বেরুতে হল বইটা আনার জন্যে। আর সেই সঙ্গে ডেঁপো ছোঁড়াটাকে বেশ করে ধমকে দেব। চৌমাথায় এসে দেখি ছেলেটা চুপ করে বসে আছে। তার কাছে গিয়ে ফেটে পড়লুম—ক'দিন কাজ শিখেছিস! সকালে সারিয়ে নিয়ে যেতে যেতে রাস্তাতেই ছিঁড়ে গেল। বলি ব্যাপার কি ? পয়সা না দিয়ে বেগার খাটিয়েছি নাকি ?

ছেলেটা বড্ড নিরীহ। আস্তে আস্তে বলল—দিন, বাগিয়ে দিচ্ছি।

মনে করেছিলুম ছেলেটাও কিছু বলবে, কিন্তু সে যখন কিছু বলল না তখন আর কিছু বলতে পারলুম না, শুধু চটিটা এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। চটিটা জলে ডুবিয়ে নিয়ে সেলাই করতে করতে ছেলেটা মুখ নীচু করে বলল—আমি কোনদিন এই কাজ করিনি। বাবাই করে। এইখেনেই বাবা বসে। মা অনেকদিন আগে মরে গেছে। বাবারও দিন পনের ধরে জ্বর হচ্ছিল। আমাকে বাবা কিছু বলেনি। কিন্তু আজ সকালে বাবার মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। মনে হয় মাঝে মাঝে বাবার ওরকম হত কিন্তু আমাকে কিছু বলেনি বাবা, তাই কিছু বুঝতে পারিনি। ডাক্তার দেখান দরকার কিন্তু দু'বেলা পেট ভরে খেতেই পাই না তো ডাক্তার দেখাব কেমন করে? মনে করেছিলুম আসবনি কিন্তু তাহলে সাবু কিনব কি দিয়ে? তাই এসেছি। বাবা একা ঘরে আছে। আর আমি এখানে সারাদিন বসে থেকে মোট বার আনা পেয়েছি। তাই ভাবছি—কি করব? বার আনায় সাবু না ওষুধ না চাল—কি কিনব? বলতে বলতে হঠাৎ ছেলেটা চুপ করল। মনে হয় কান্নায় আর কিছু বলতে পারলে না। এক ফোঁটা জল চোখ থেকে গড়িয়ে সেলাই-করা জায়গাটায় টপ করে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সেলাই শেষ করে সুতোটা কেটে চোখটা ছেঁড়া গামছায় মুছে বলল—নিন বাবু। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল—আর দশ পয়সা দিন না বাবু! কোনরকমে যদি ঐ দোকান থেকে বাবার ওষুধটা নিয়ে যেতে পারি।

গল্পটা বেশ। বুঝলুম সেই বুড়োটারই ছেলে এ। কিন্তু তা বলে আরও দশ পয়সা! মুখ ভেঙচে বললুম—আর দশ পয়সা! বলি তোকে পয়সা না দিয়ে করিয়েছি নাকি? আমার বাবার কি তালুক আছে? তুই বললেই অমনি দেব। বলে চটিটা পায়ে গলিয়ে এগোলুম বোর্ডিংএর দিকে। মনোজের কাছ থেকে বইটা নিয়ে বাড়ি এলাম। পড়তে পড়তে একজায়গায় দেখলুম—

"যদি ভিক্ষা করিয়া পিতামাতাকে খাওয়ানো যায় তথাপি তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করা যায় না।"

মনে পড়ল ছেলেটার কথা, মনে পড়ল তার কষ্টের কথা, তার ভিক্ষার ভাষা, আর তার বাবার রক্তমাখা মুখখানা। ভাবলুম ছেলেটা আমার কাছে চটির জন্যে না চেয়ে ভিক্ষেও তো চেয়ে থাকতে পারে। ভাবলুম ছেলেটাকে চার আনা দিয়ে আসি। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বেরুলেই মার বকুনি খেতে হবে, সুতরাং কাল সকালেই যাব।

বকুনির ভয়ে নটা পর্যন্ত পড়ে বইটা হাতে করে বেরোলুম চৌমাথার দিকে। এসে দেখি ছেলেটা আসেনি। অন্য সবাই এসেছে। একজনকে তার জায়গায় বসতে দেখে জিজ্ঞেস করলুম—কাল যে ছেলেটা এখানে বসে ছিল সে কোথায়?

—তার বাবা কাল রাত্রে মরে গেছে তাই আসেনি।

মনে পড়ল সেই লাইনটার কথা—

"যদি ভিক্ষা করিয়া পিতামাতাকে খাওয়ানো যায় তথাপি তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করা যায় না।"

ছেলেটা তার কর্তব্য পালন করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি, সম্ভব হয়নি, হতে দিইনি আমরা, আমি। নিজেকে দোষী মনে হল। পিতামাতার প্রতি ভক্তি দেখে তার প্রতি শ্রদ্ধা জাগল মনে। তার তুলনায় অত্যন্ত ছোট মনে হল নিজেকে। পিতামাতার প্রতি কর্তব্য আমাদের শুধু বই মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করার জন্যে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু। কিন্তু ছেলেটা? আমাদের থেকে কত নিম্নস্তরের। তবুও মনে হল আমিই নীচ, আমিই ছোট। ওর তুলনা আমার সঙ্গে হয় না। মনে পড়ল তার সঙ্গে কত কটু ভাষায় কথা বলেছি আর তার সেই এক ফোঁটা চোখের জল যেটা ছেঁড়া জায়গায় পড়েছিল। মনে হয় ওই জায়গাটা আর কখনও ছিঁড়বে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে নেই, কিন্তু সম্বিৎ ফিরল মুচীটার ডাকে।

—পালিশ করে দেব খোকাবাবু?

—না। ছোট উত্তর দিয়ে কোনরকমে নিজেকে লুকিয়ে মনোজকে বইটা ফেরত দিয়ে বাড়ি ফিরলুম। মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। পকেটের পয়সা পকেটেই রয়ে গেল। চোখে পড়ল নূতন-আসা এ মাসের শুকতারাটা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে শেষের পাতায় নজরে পড়ল এক কোণে ছাপা বড় বড় অক্ষরে ঘন কালি দিয়ে—

".....

৺শ্রীশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছি। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ঃ— পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের উপর গল্প।"

দেখেই মনটা নেচে উঠল আনন্দে। যাক, ছেলেটার কথা যদি তুলে দিতে পারি তবে আমার বেদনার কিছু লাঘব হতে পারে। তাই এই গল্পটাই পাঠিয়ে দিলুম, আর নাম দিলুম—ছেলেটা—

"৺শ্রীশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"র
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

সম্পাদক

শ্রীঅরুণ দে

আশী নব্বুই বছর আগেকার কথা।

তখনকার দিনে সাধারণ লোকেরা সাহেবদের জুজুর মত ভয় করত। সাহেব দেখলে পথ ছেড়ে সাত হাত দূর দিয়ে পথ হাঁটত। যদি কোন সাহেব দেশীয় লোকের দিকে তাকিয়ে কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করত তাহলে তার গর্বের অন্ত থাকত না। সাহেবের চোখে ছোট হবার ভয়ে প্রয়োজন হলে দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করতে দ্বিধা করত না।

দেশের যখন এই রকম অবস্থা তখন একজন কাগজের সম্পাদক খুব নাম করেছিলেন।

একদিন তিনি বাড়িতে বসে প্রুফ দেখছেন, এমন সময় এক সাহেব এসে উপস্থিত। বড় বড় রাজকর্মচারীরা নানা কাজে প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন। এই সাহেবও এসেছিলেন নিজের দরকারে।

তখনকার দিনে মোটরগাড়ি ছিল না। সাহেবসুবারা ঘোড়ায় চড়তেন। ঘোড়া থেকে নেমে সাহেব এমন কাউকে পেলেন না যার কাছে ঘোড়া জিম্মা করে দিতে পারেন। আবার ঘোড়াটি ছেড়েও তো ভিতরে যাওয়া যায় না।

সহসা সাহেবের নজর পড়ল বাহিরের উঠানে একটি লোকের ওপর। লোকটি তখন ঘাস তুলছে। আটহাতি ময়লা কাপড় পরনে, খালি গা, খালি পা। ঐ বেশে কোন লোককে চাকর ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। সাহেবও তাই ভাবলেন। কাছে গিয়ে ঘোড়ার লাগামটি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,—পাকড়াও!

ঘরের ভিতর থেকে সম্পাদক মশাই ব্যাপারটা দেখতে পেলেন, তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, বললেন,—আহাহা সাহেব করছেন কি!

—কেন, চাকর ঘোড়া ধরতে পারবে না ?

—উনি চাকর নন, উনি আমার পিতৃদেব। দিন আমি আপনার ঘোড়ার লাগাম ধরছি।

সেই স্বনামধন্য সম্পাদক চাকরের মত ঘোড়া ধরতে এগিয়ে এলেন দেখে সাহেব মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি বললেন,—ক্ষমা করুন, আমি বুঝতে পারিনি !

তখনকার দিনে কোন লোক অপরিচ্ছন্ন বেশধারী ব্যক্তিকে কোন রাজপুরুষের কাছে নিজের পিতা বলে পরিচয় দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। শুধু তখনকার দিনের কথা নয়, এখনও বহু ব্যক্তি নিজেকে কোন দরিদ্র ব্যক্তির আত্মীয় বলতে লজ্জা পান।

কিন্তু সেই সম্পাদক তাঁর বাবাকে এত ভালবাসতেন যে অপরিচিত রাজপুরুষের হাতে বাবার সম্মানহানি হচ্ছে দেখে স্থির থাকতে পারেননি। এত শ্রদ্ধা করতেন তিনি তাঁর পিতাকে।

সেই রাজপুরুষও সাধারণ মানুষের দুর্বলতার কথা জানতেন। তাই সম্পাদক সেই অপরিচ্ছন্ন বেশধারী ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেওয়াতে সম্পাদকের পিতৃভক্তি ও সৎসাহসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। এই সম্পাদক হলেন এদেশেরই এক স্বনামধন্য মানুষ কৃষ্ণদাস পাল।

রাঁচী হইতে শ্রীমতী অপর্ণাবালা সেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ৺নিমাইচন্দ্র সেনের অকালমৃত্যুতে তাহার পুণ্যস্মৃতিরক্ষা-কল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করিয়াছেন

তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺নিমাইচন্দ্র সেন স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার

রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ : ৩০শে কার্তিক ১৩৭৫। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা ১৩৭৫ পৌষ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হইবে।

প্রথম পুরস্কার ১০৲ টাকা **দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲ টাকা**

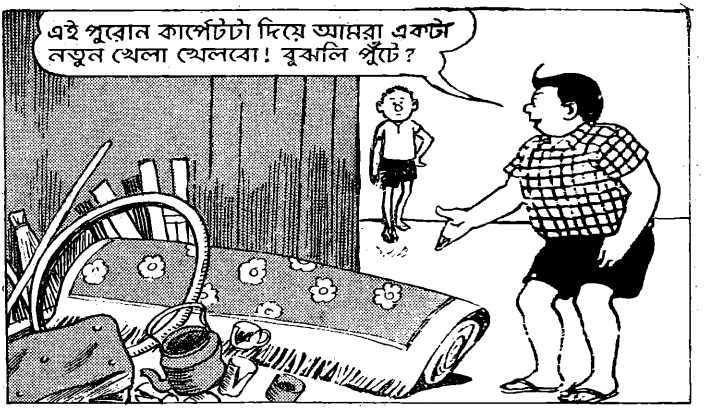

হাঁদা-ভোঁদার
নতুন খেলা
এই পুরোন কার্পেটটা দিয়ে আমরা একটা নতুন খেলা খেলবো! বুঝলি পুঁটে?
এতে বল খেলার কি রকম প্র্যাকটিস্ হবে দেখবি!
ভাল করে টেনে তোল!
৫
১০
১০
এবারে বুঝেছি! গোলে গোল-কিপার দাঁড়িয়ে। আমরা চারপাশে বল মেরে পয়েন্ট তুলবো!
চমৎকার সট! তোর পাঁচ পয়েন্ট হলো ভোঁদা!

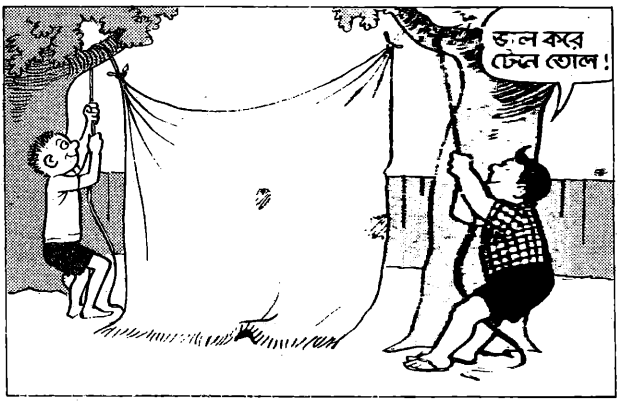

কি খেলছিস রে ভোঁদা ?
একটা নতুন খেলা ! নাম দিয়েছি কার্পেট-বল ! তুই যদি গোলকিকে লাগাস তবে তোর পয়েন্ট নষ্ট হবে !
ওঃ এই ! সরে দাঁড়া ! তোকে নির্ভুল শট কাকে বলে দেখাচ্ছি ! কত নম্বরে লাগাবো বল ?
দশে লাগা !
ফ্যাচ্
এঃ ! তুই একেবারে কার্পেটের ঠিক মধ্যিখান ফুঁড়ে বল বার করে দিয়েছিস !
কোন উজবুক বল মেরেছে দেখি একবার !
হাঁদা ! তাড়াতাড়ি কেটে পড় !
এইমে ! তুই তাহলে আমার এই হাল করেছিস ? তবে দ্যাখ হতভাগা !
হিঃ-হিঃ ! আমাদের নতুন খেলায় তুই সত্যিই নতুনত্ব দেখিয়েছিস হাঁদা !

বলিদান

দেবীপ্রসাদ সিংহ

গোলাপহাটি গ্রাম দিয়ে হেঁটে চলছিলাম। দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি দেখাচ্ছিল মোড়ল ভুবন সাঁতরা। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম গ্রামের বহুপুরনো গড়, নাম 'রাজার গড়'। এখন শুধু ধ্বংসাবশেষই আছে। ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম এক বিশাল দীঘির সামনে। এখন তেমন জল না থাকলেও বিশালত্বটুকু উপলব্ধি করা যায়। নাম শুনলাম 'রাজা মহিন্দরের দীঘি'।

মোড়ল তাকিয়ে ছিল জলের দিকে। অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলো দীঘির জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে সোনার মত চিকচিক করছিল। এক স্বপ্নজগৎ যেন সৃষ্টি হচ্ছিল।

আমিও চেয়ে ছিলাম জলের দিকে। গড়ের ধ্বংসাবশেষ জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে কাঁপছিল। তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলাম। তন্ময়তা ভাঙল মোড়লের ডাকে। শুনলাম মোড়ল বলছে, "হুজুর, এ দীঘির এক করুণ ইতিহাস আছে। শুনবেন?"

—"বলো, শোনা যাক।" আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

দীঘির দিকে চেয়ে মোড়ল বলতে আরম্ভ করল।—

* * * *

—"বলি পাওয়া যায়নি? অসম্ভব! নৃমুণ্ডমালিনী মা আমার রক্ত ছাড়া তৃপ্ত হন না। নরবলি তাঁর চাই-ই। ঈশ্বর, তোমাকে আনতে হবে বলি খুঁজে। লগ্ন বয়ে চলেছে। যাও দেরি কোর না।"—গমগম করে উঠল গোলাপহাটির রাজা মহেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর।

অভিবাদন করে ঈশ্বর লেঠেল বেরিয়ে যায়।

পূজাপ্রাঙ্গণে অস্থিরপদে পায়চারি করতে থাকেন রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ। খবর পেয়েছেন, ছেলে দীপেন্দ্রনারায়ণ ক'দিনের মধ্যেই ফিরে আসছে। আজ তিনি মা কালিকার কাছে পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করবেন। অথচ পূজায় এবার বিঘ্নের সৃষ্টি হল। অন্য বছরে নির্বিঘ্নে পূজা হয়ে এসেছে। বলি হয়েছে আর তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখছেন মা কালিকার তৃপ্ত প্রসন্ন মুখমণ্ডল। চার হাতে মা রক্তপান করছেন আর তাঁকে যেন আশীর্বাদ করছেন। বাইরে সন্তানহীনা জননীর বুকফাটা আর্তনাদে তিনি হয়েছেন ক্রুদ্ধ, সিপাহী, বরকন্দাজ দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন।

জমিদারের দেহ ভেসে উঠেছে। [পৃষ্ঠা ৬০৮

অতীতে ফিরে গিয়েছিলেন রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ। চমক ভাঙল এক গোলযোগের ধ্বনিতে।

ঈশ্বর লেঠেল অভিবাদন করে বলল, "কত্তা, বলি ধরে নিয়ে এইচি।"

বলি আর দেখলেন না রাজা। তাঁর আদেশ ধ্বনিত হল ঃ "যাও, বলিকে কোরা কাপড় পরিয়ে চান করিয়ে নিয়ে এসো। লগ্নকাল উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।"

ওরা চলে গেল। অন্তরে স্বস্তি বোধ করেন রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ। পুরোহিতকে পূজা সমাপন করতে বলেন।

বার বার ছেলের কথা ভিড় করে আসছে রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের মনে। ছ'বছর আগে কাশীতে অধ্যয়ন করতে গিয়েছে ছেলে। এখন কৃতী হয়ে ফিরে আসছে সে আজকালের মধ্যেই। কিন্তু কি এক অমঙ্গলের আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছে রাজা মহেন্দ্র-নারায়ণের মনের কোণে ক্ষণে ক্ষণে! বুক কেঁপে ওঠে অত্যাচারী রাজার।

কিন্তু এই চিত্তবিভ্রম আজ তাঁর হচ্ছে কেন! অমঙ্গলের আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে দিলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলেন বলিকে হাড়িকাঠে বাঁধা হয়েছে। লোকটির গোঙানির মৃদু শব্দ কানে আসছে।

পুরোহিত গম্ভীরস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। রাত দ্বিতীয় প্রহর। কিছু শেয়াল শিবাধ্বনি করে প্রহর জানান দিল।

পূজা সমাপন হল। প্রস্তুত হয়ে নিলেন গোলাপহাটির শাক্ত রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়। দৃঢ়পদক্ষেপে খাঁড়া হাতে এগিয়ে গেলেন তিনি বলির দিকে। 'মা মা' রব উঠল প্রাঙ্গণ হতে। মা কালিকা যেন নররক্তের স্বাদ গ্রহণের জন্য লেলিহান জিহ্বা মেলে দাঁড়িয়ে আছেন মুণ্ডমালা গলায় পরে। দু'দিকে তাঁর চিরসহচরী ডাকিনীবৃন্দ যেন নররক্ত পানে উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের খাঁড়া দুলছে শূন্যে। নেমে এল সেই খাঁড়া। হঠাৎ এক আর্তস্বর ভেসে এল রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের কর্ণকুহরেঃ "বাবা, আমি তোমার ছেলে। বাবা বাবা···!" কিন্তু সময় ছিল না। খাঁড়া যমের মত নেমে এল রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র দীপেন্দ্রনারায়ণের গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। মহেন্দ্রনারায়ণ দেখতে পেলেন যেন সেই রক্তে তাঁর প্রাসাদ, মাঠ, ঘাট, তাঁর লোভ, অহংকার সব ভেসে যাচ্ছে।

—"মা, এ কি করলি তুই মা! আমার ছেলেকে নিলি! তবে তাই হোক।"

অপ্রকৃতিস্থের মত মাথা চেপে ধরে ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ।

পরদিন প্রজারা সবিস্ময়ে দেখল তাদের জমিদারের দেহ এই দীঘিতে ভেসে উঠেছে। মুখমণ্ডল যেন অতি প্রশান্ত। তাঁর নামেই এই দীঘির নাম তারা দিল 'রাজা মহিন্দরের দীঘি'। আজও যদি কেউ অমাবস্যা রাত্রে এই দীঘির তীরে আসে, সে দেখতে পায় এক বিক্ষুব্ধহৃদয় রাজা যেন 'মা, আমাকেও নে তোর কোলে' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন দীঘির জলে।

মোড়ল থামল। অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। দীঘির দিকে ফিরে দেখি। পূর্ণিমার চাঁদ দীঘির জলে বিম্বিত হয়ে খানখান হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। যেন স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে।

আমার মনের পটে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ তাঁর ক্রোধ, লোভ, অহংকার বুকে নিয়ে তলিয়ে গেলেন দীঘির অথৈ জলের আহ্বানে, সুশীতল জল তাঁর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারবে মনে করে। হয়তো রাজার আশা পূর্ণ হয়েছে। মৃত্যুতে তিনি পেয়েছেন শান্তি।

উঠতে যাব, দেখলাম মোড়লের চোখ চিকচিক করছে। আমার নিজের চোখ কখন ভিজে উঠেছে টের পাইনি।

নতুন তথ্য

শ্রী রাসবিহারী ভট্টাচার্য

❁

রোম অলিম্পিকে দশ সেকেণ্ডে একশো মিটার দৌড়ে যিনি বিজয়ী হয়েছিলেন ও যাঁর রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারেনি তাঁর নাম আরমিন হ্যারী। রোম অলিম্পিকের পর গাড়ির দুর্ঘটনায় পড়ে হ্যারীর পায়ে আঘাত লাগে এবং তাঁকে স্পোর্টস্ ছেড়ে দিতে হয়। সম্প্রতি হ্যারী চুন-সুরকির কারবারী লক্ষপতি এরিখ বাগুসার্টের কন্যাকে বিবাহ করে শ্বশুরের ব্যবসায়ে যোগদান করেছেন। ইতঃপূর্বে হ্যারী স্পোর্টস্ সম্বন্ধে 'পাক্কা দশ সেকেণ্ড' বইও লিখেছেন।

❁ ❁ ❁ ❁

হল্যাণ্ডে ৩০০০ বছর আগে মারা গেছে এমন একটি মিশরীয় মমীর উপর বিশেষজ্ঞরা রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করে আশ্চর্য তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এ ছাড়া আরও কতকগুলি মমীর উপর রশ্মি প্রয়োগ করা হয়েছে।

মমীগুলোর এক্স-রে ফটো নিয়ে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো হলো—প্রাচীন মিশরীয়দের মোটামুটি আয়ু ছিল ৩০ বছর, এবং যতগুলি মমী পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে সেগুলির কোনটিই ৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচেনি। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হলো, এই সব মমীর কোন কোনটি তাদের জীবদ্দশায় যে সব অপরাধ করেছে তা জানতে পারা গেছে। ডাঃ গ্রে এটি আবিষ্কার করেছেন।

❁ ❁ ❁ ❁

কুকুরেরা যে কামড়ায় তার কারণ কি তাদের মধ্যে নেকড়ের মনোবৃত্তি রয়েছে বলে? যে কুকুর কামড়ায় সে কি স্বভাবতঃই প্রতিহিংসাপরায়ণ? যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটনের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অনুশীলন করে এই সব প্রশ্নের উত্তর বের করেছেন।

তাঁরা বলেন, কুকুরেরা কামড়ায় কোন ব্যাপারে নৈরাশ্যের তাড়নায়। দু-তৃতীয় সংখ্যক দংশনের ক্ষেত্রে বিদ্বেষভাব পাওয়া যায় না। কুকুরেরা কামড়ানোর ব্যাপারে ব্যক্তির বাছবিচার করে না। সুবিধামতো যাকে পায় তাকেই তারা কামড়ে দেয়।

আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে কুকুরের কামড়-খাওয়া ব্যক্তির মধ্যে মেয়েদের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা দেখা যায় দ্বিগুণ। আবার কুকুরের চেয়ে কুকুরীর দংশনপ্রবৃত্তি দ্বিগুণ।

বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, কুকুরেরা বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে জুলাই ও অগস্ট মাসে এবং শীতকালে সপ্তাহান্ত দিনে।

* * * *

লস এঞ্জেলসে এক আধুনিক দানবীরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যিনি লোকের মুখাবয়ব পরিবর্তনের খরচ দেন।

মধ্যবয়সী এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের এই খেয়ালটি দেখা দেয় বছর কতক আগে এক খ্রীষ্টমাস উৎসবকালে।

ভদ্রলোক তাঁর রূপহীনা সেক্রেটারিকে জিগ্যেস করেন সে কি ধরনের উপহার পছন্দ করে।

সলজ্জভাবে মেয়েটি উত্তর দেয়ঃ "অন্য কিছুর চেয়ে আমার সবচেয়ে দরকার নতুন মুখাবয়ব।"

ব্যবসায়ী প্লাস্টিক সার্জনকে দিয়ে সে ব্যবস্থা করে দেন। মেয়েটি রূপ লাভ করে এবং তার বিয়েও হয়ে যায়।

খবরটি ছড়িয়ে পড়ে এবং উক্ত ব্যবসায়ী খুশী হয়েই অন্যান্য স্বল্পবিত্ত ব্যক্তিদের মুখাবয়ব সুন্দর করে তোলায় সাহায্য করতে থাকেন। ভদ্রলোক স্বীকার করেন যে, এইভাবে লোকের মুখশ্রী ফুটিয়ে তোলাটা বেশ খরচসাপেক্ষ শখ। তবে "এইভাবে খরচ না করলে টাকাটা যে কর হয়ে গভর্নমেণ্টের হয়ে যাবে।"

* * * *

আজারবাইজানের সবচেয়ে বয়স্কা মহিলার বয়স ১৩৪ বছর। তাঁর গ্রামের বাসিন্দাদের গড় বয়স ৮০ থেকে ৯০।

গ্রামের বাসিন্দাদের তিন-চতুর্থাংশই হয় তাঁর বংশধর কিংবা অন্যভাবে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ।

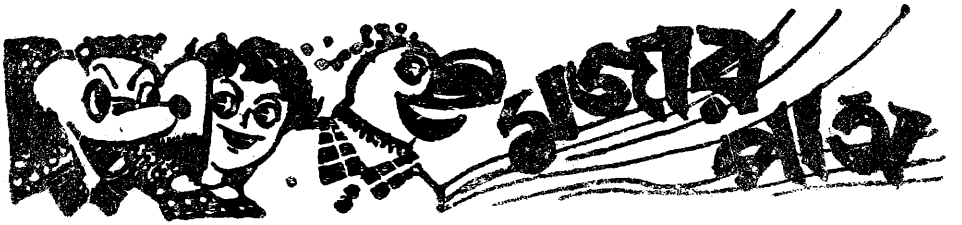

নতুন ধাঁধা

১। জননীরে রাখে ঘিরে শত জনে ভাই
শেষ আছে শুরু নাই, ভাবিয়া না পাই।

—চম্পককুমার চক্রবর্তী, গোতলাহাট, ২৪ পরগনা।

২। বাস করি যেখানে
দেবতা থাকেন সেখানে।

—অশ্বিনীকুমার পাল, আদ্রা, পুরুলিয়া।

৩। চার অক্ষরে দেখ তাহা শত্রুনাশ করে,
শেষার্ধ ছেড়ে দিয়ে পশু নাম ধরে।
এক আর চারে কর মুখখানি নীচু,
ভেবে দেখ হদিসটা পাও নাকি কিছু?

—নারায়ণচন্দ্র কর্মকার, ধানসিমলা, বাঁকুড়া।

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। আয়না ২। সেতার ৩। মেঘনা

গত মাসের ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—নাড়ু, বীরু ও মাধুরী মাহাতো—কলিকাতা-৪৩; রীণা, মানস, ডলি, বাবা ও মা—স্যার গুরুদাস রোড; রজত, রঞ্জন ও সঞ্জয়—সাদার্ন এভেনিউ; বিশ্বনন্দন, কবিতা, স্মৃতি ও ডল দাস—গর্চা ফার্স্ট লেন; নীলা, শুভেন্দু ও অপর্ণা সেন—মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেন; বাপ্পা ও পম্পা সেন—২৩৪৪৫; বুবুন, জগা, রেবা ও দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—স্কট লেন; বাবী, মিলু, মান্তু, বাপী ও বুবলাই—ধর্মতলা স্ট্রীট; মিঠু, বুড্ডা ও লালা—বকুলবাগান রোড; অমিত, বাবা, মা, কাকু ও ঠাকুমা—গুরুদাস রোড; রাণী, মানিক, মিনু, কানু, টুলু—বিজয়গড়; কাবলী, ডাবলী, সোনালী, কাকলী, আনন্দ প্রভৃতি—যতীন দাস রোড; সোমা, সোমনাথ, বাবা, মা, দাদা ও ঘোটন—মিডল্ রোড; সমীর, তিমির, বারিদ, তড়িৎ ও মিনতি—লালাবাবু লেন; অঞ্জু, বুড়ি ও খোকন—নিবেদিতা লেন; রঞ্জিত, উমা, টিঙ্কু ও টুকাই মুখার্জী—ধর্মতলা স্ট্রীট; শ্যামল ঘোষ—বি, টি, রোড; রীতা ও বাবা—মানিকতলা মেন রোড; নন্দদুলাল দাস ও সীতাংশুশেখর চ্যাটার্জী—প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন; অরূপ, মিতালী, বাপী, মা, ভাই প্রভৃতি—সেলিমপুর রোড; প্রতাপ, টুটুল, ঝুমা, তোত, দেবুল প্রভৃতি—নবগৌরাঙ্গ বসাক রোড; অলোক, গোলক, পুলক, প্রতিভা ও ডলি—রানী হর্ষমুখী রোড; গৌতম ও শ্রীলেখা—দমদম এস্টেট; সোণালী রায়—কবীর রোড; সুস্মিতা, শুভাশিস, সুদীপ্ত, শ্রাবণী ও শর্মিলা—বেহালা; সুমিতা, সঙ্গীতা, রীতা, চৈতী ও শুভা—পাতিপুকুর; আশীষ, অণিতা ও কল্পনা সেন—যাদবপুর; টুকু, মৌ, পাপু, বুকু, ইনু ও ছোট কাকু—বেণীনন্দন

স্ট্রীট ; অভিজিত, অম্বরীষ, অমিতাভ, অরিন্দম ও নবনীতা—কবীর রোড ; দীপঙ্কর বসাক—২১৮৭৩ ; অজিত, অঞ্জলী, মন্টি, পুতুল ও গৌরী—বিরাটী ; রিংকু, টিংকু, মামু, রাঙ্গামাসী, মাসীমণি প্রভৃতি—সাউথ সিঁথি রোড ; শ্যামল, কল্যাণ, চিত্রা, স্বপ্না ও দেবু—আড়িয়াদহ ; দিবু, মিঠু, পাপিয়া ও সুপ্রিয়া—মাধব চ্যাটার্জী লেন ; বেবী, খোকন, ঝোটন ও টোটন—গাঙ্গুলীপাড়া লেন ; শক্তি, রুদ্রেন্দ্র ও রাখী রায় চৌধুরী—সাতগাছি ; মা, বাবা, দাদা, বৌদি প্রভৃতি—সি, আই, টি, রোড ; দীপকদা, খুকু ও সুমিত—নাকতলা ; রীণা ও দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী—লেক প্লেস ; কৃষ্ণা ঘোষ—রাজা বসন্ত রায় রোড ; বাবু, ছোটন, খুকু, শেলু, বাচ্চু, রুমু প্রভৃতি—যাদবপুর ; তপন ; সংঘমিত্রা ও মধুমিতা বসু—রমেশ মিত্র রোড ; মণিকাকু, বাপী, মামণি, শম্পা ও অরুণ—? ; অপর্ণা মুখোপাধ্যায়—ডাঃ রাজেন্দ্র রোড ; ছন্দা, সোমনাথ, অমরনাথ, সুদীপ ও পূর্ণা—দেবেন সেন লেন ; গীতা, রাণী, চম্পা, সোমা, সন্ধ্যা ও সুলেখা—কলিকাতা-৩৭ ; বাবুজী, সীমা, রজত, টিংকু ও পিয়ালী—গল্‌ফ ক্লাব রোড ; সঙ্কিতা ঘোষ—সূর্য সেন স্ট্রীট ; জয় ও বিশু—মহানির্বাণ রোড ; সুরজিত, তুলিন, তাতু, জয়া, পট্টু, বাবু প্রভৃতি—২৩৮৯৮ ; মাধব, লীলা, নির্মাল্য, আরতী, দেবাশীষ ও শুভাশীষ চট্টোপাধ্যায়—সাদার্ন এভেনিউ ; গৌর, খুকু, রীণা, গোপা, দাদা ও শীলা—রাসবিহারী এভেনিউ ; রজতাভ, সৌমাভ ও শম্পা মিত্র—ঝামাপুকুর লেন ; স্বপন, শম্ভু, বাবু, বাণী, কল্যাণী ও মশাই—বরানগর ; বুলবুলি, খোকন প্রভৃতি—কাশীপুর রোড ; কাকলী ও চৈতালী—চণ্ডীতলা লেন ; যূথিকা, শিখা, চীনা ও দীপালী বন্দ্যোপাধ্যায়—আর, কে, ঘোষাল রোড ; মামণি, বাবুল, সনুয়া, ছোটন ও সোনা-মণি—গোবরা রোড ; হীরক নাথ—রাসবিহারী এভেনিউ ; বুবলি, দেবাশীস ও দেবব্রত সোম—গ্যালিফ স্ট্রীট ; মৃণাল, দেবব্রত ও জয়ন্ত ব্যানার্জী—গোকুলবাবুর বাজার ; স্বাতী মিত্র—সুকিয়া স্ট্রীট।

২৪ পরগনা—কৃষ্ণা, শুক্লা, সুজাতা, চৈতালী, অমিত প্রভৃতি—রাজপুর ; রানা ও নূপুর চট্টোপাধ্যায়—দত্তপুকুর ; রীণা, ডলি, শুভলক্ষ্মী, দেবকুমার, বাবা ও মা—ভাটপাড়া ; দেবব্রত দত্ত—খড়দা ; বাবা, সন্তোষ ও শান্তিময় হাজারা—দেউলী ; বাণী, রুণা, বাচ্চু, বুবু, তাতা ও রত্না—বারাকপুর ; গায়ত্রী, মা, বাবা ও রমা-প্রসাদ নাথ—নৈহাটী ; মা, তুতুন, ছুটুয়া, মিতু, নূপুর ও পুলক—জগদ্দল ; বাঁলি, কাজল, হারু, মানা ও বুতো—হরিনাভি ; শৈলেন, শঙ্কর, পিনাকী ও কুন্তলা গড়গড়ি—অম্বিকানগর ; সিতাংশু, দিলীপ ও সাধন—ইছাপুর ; কুচু, ছোড়দি, ছোড়দা, ভুক্কা, ভাকু ও মা—গরিফা ; বাবুজী, শিবাজী, মামণি ও ছোটমা—বেলঘরিয়া।

হাওড়া—পিতম ও পিয়ালী চট্টোপাধ্যায়—২১৪২১ ; রণেন্দ্রনারায়ণ, সমরেন্দ্রনারায়ণ, কীর্তিলেখা, দীপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ—মুক্তারাম দে লেন ; বৌদি, মিখিলদা, যোগেনদা, রাজেনদা, পুলু, বিজয় প্রভৃতি—বি, ই, কলেজ ; সুনীল-কুমার মান্না ও নগেন্দ্রনাথ সামন্ত—জয়পুর।

হুগলী—বাচ্চু, তাপস ও ভাইটুকু দাশগুপ্ত—উত্তর-পাড়া ; মলয়া, মালবিকা, মঞ্জুলিকা, মল্লিকা ও ইন্দ্রজিৎ আদগিরি—সেওড়াফুলি ; কৃষ্ণচন্দ্র ভড়—চাতরা ; আর. বি. ব্যানার্জী—শ্রীরামপুর ; রামরাম, শ্রদ্ধারাণী, গৌতম, মৃণালকন্তি ও তুষারকান্তি ভট্টাচার্য—পারস্যামপুর ; জ্যোতির্ময়, দেবু, উদয়, মুনমুন, পার্বতীশঙ্কর ও শুভ্রা—চন্দননগর ; গৌতম, মেলী, বুলুন, শিবাজী ও অলোককুমার চট্টোপাধ্যায়—হুগলী ; অসিত, শিবানী, মনীন্দ্র, মীরা, অশোক, ভারতী ও আলো—চকবাজার ; অপর্ণা, দীপালী, মধুসূদন, মা ও বাবা—রিষড়া ; কমলা, শ্যামলী, সমীরণ, অনুপম, জ্যোতির্ময় প্রভৃতি—চন্দননগর।

বর্ধমান—পার্বতী রায়—আর. বি. ঘোষ রোড ; ভবানী, বাবী, মান্তা, রঞ্জিতদা ও শান্তিদিদি—চিত্তরঞ্জন ; ডলি, মল্লিকা ও অরূপ দাস—ছোটনিষারী ; বাবা, মা, দাদা, রেণুকা, সোমা ও সুব্রত কর্মকার—ছোটনিষারী ; সমর, সনৎ, নমিতা, অনিতা, সুনীতা ও টিংকু সিংহ—রামকৃষ্ণ রোড ; অনিল, গোপাল, বিমল, অমল, খোকন প্রভৃতি—সীতারামপুর ; ধনু, রূপুষ, ভাই, বেণু ও বিনয় মুখার্জী—বরাকর রেল কলোনী ; বাবা, মা ও রঘুনাথ চন্দ্র—বার্নপুর ; হাসি, অপু, অনুপ, টুকাই ও পার্থ—বার্নপুর ; মধুমিতা দাশগুপ্তা—ধাদ্‌কা ; বাগড়িহা সিদ্ধপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ—বীরকুলটী ; মেজদা, সেজদা, অশোক, দীপক ও ডলি—কল্যাণী ; বাবা, মা, চন্দন, বিশ্বজিৎ ও রণজিৎ ঘোষ—অণ্ডাল ; তন্ময়, চিন্ময়, জগন্ময় ও হিরণ্ময়—মুরগাশোল ; মধুসূদন, মায়া, মলয় ও সোমা সাহা—দুর্গাপুর ; জলি, মিলি, পল্টন, মিল্টন ও গোরা ঘোষ—বার্নপুর ; রীণা, সীমা, পামেলা ও কুমকুম গাঙ্গুলী—বার্নপুর ; ইন্দ্রাণী ও অসিত বসু—আসানসোল ; টুবু, সুমন, টিটুল ও পুতুল—দুর্গাপুর-৯ ; জয়ন্ত, অশোক, শর্মিলা, সুটু ও ভুটু—আসানসোল ; রমা, প্রভাত, শুভ্রা ও নন্দিত—বার্নপুর ; বুলা, খুকু, দেবু, বাপি, বুবুন, পরেশ ও জ্ঞান রাউৎ—আহিড়ীপাড়া ; মা, মনু, মালা, সজল, বিপ্লব, বাপী ও বুলা—রানীগঞ্জ ; সুজাতা, কল্যাণী, প্রদোষ, শোভনা ও ভুলো—কাটোয়া ; খোকা, মায়া,

বিশ্বরূপ, টুলু, কচি, বাবু প্রভৃতি—রানীগঞ্জ ; সাগর, লগোন ও প্রদ্যোত—বার্নপুর ; দুলালী, টুকু, মিনু, পিণ্টু, ময়না, মণি প্রভৃতি—বার্নপুর ; দাদা, দিদি, গুনু, বাচ্চু, কল্যাণ ও বেলা—সাঁকতোড়িয়া ; বাপি, তোতন, বুলু ও টুলু—দুর্গাপুর-৫ ; কুমার, বাবলু, সন্তোষ ও নিতাই—রানীগঞ্জ ; মঞ্জুশ্রী কর্মকার—দুর্গাপুর-২ ; বনানী, ইরানী, সোনালী ও রূপালী কাঞ্জিলাল— ? ; **সিরাজুল হক মল্লিক**, কেরিমা ও অফিয়া খাতুন—পিচকুড়ি ; **রবিন**, মান্নু, সান্নু, রীতা, সুমু ও প্রভাস দত্ত—ছোটদিঘারী।

নদীয়া—অনসূয়া, মধুস্মিতা, চৈতালী, দুষ্টু ও বাবুলি—কৃষ্ণনগর ; মা, বাবা ও মামু গুপ্ত—মোহনপুর ; রঞ্জিৎ, বিউটি, সত্যজিৎ, আরতি, মিলু প্রভৃতি—কৃষ্ণনগর ; মুকুল, কাজল, গোপাল, প্রতিমা প্রভৃতি—কৃষ্ণনগর ; স্বপ্না, শুভ্রা, কাকলী ও উত্তমকুমার—কৃষ্ণনগর।

মেদিনীপুর—বুনু, বাবলু, টুকলু, উমা, সীমা ও ঝুনা—ঝাড়গ্রাম ; রঞ্জনা, নিমাই, মানসী ও দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য—[illegible] ; বাবা, মা, ভুটু, ঝুমারী, বাপী ও খোকন—[illegible] ; উদয়, মলয়, মদন, সুপ্রীতি ও কেনারাম—খড়্গপুর ; নিখিল, তাপস, ছায়া, মলয়, নীহার, শুকদেব—[illegible] ; সতীদি, ইন্দ্রাণীদি ও রাণীবিনোদ মঞ্জরী বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টমশ্রেণীর ছাত্রীরা—ঝাড়গ্রাম ; মৌ, শুক্লা, কবিতা, মিত্রা, আল্পনা ও আমি—ঝাড়গ্রাম ; রামানন্দ, তুলসী, ফাল্গুনা ও অনুপ—মেদিনীপুর ; তাপস, [illegible], তুলসী, দেবদাস ও হরিদাস গাঙ্গুলী—পাটনাবাজার ; দীপককুমার মুখোপাধ্যায়—২২২১৫ ; শ্রীশ্রীধর সামন্ত—কাখুরিয়াবাড়ী ; জ্যোতিকণা ও নারায়ণ মুখোপাধ্যায়—খড়্গপুর ; মাংতা, উষা, খোকন ও জোছন—কাখুরিয়াবাড়ী ; খোকা, জয়া, কচি ও খুকী—কাখুরিয়াবাড়ী।

বাঁকুড়া—স্বর্ণেন্দু, পূর্ণেন্দু, অর্ধেন্দু ও মমতা কর্মকার—বেলিয়াতোড় ; মেজদা, কবিতা, শিপ্রা, তপতী, খুকু প্রভৃতি—সিমলাপাল ; নির্মল, শঙ্কর, বুলেট ও বাদল—বিষ্ণুপুর গড়গড়ান ; অসিতকুমার চন্দ্র—পাত্রসায়ের ; বিপ্লব, উত্তম, শম্পা, অলকা ও অম্বিকা—ভক্তাবাঁধ ; রাধারানী, পুষ্প, চায়না, কৃষ্ণা, আরতি প্রভৃতি—তিলুড়ী ; প্রভাত, তৃপ্তি, দীপ্তি, প্রদীপ ও মুক্তি—দুর্লভপুর ; আশা-মুকুল ও বেলা রায়—পিয়ারডোবা ; বাপী, বুবুল ও টুবুল—পিয়ারডোবা ; বুলা, অমু, কাজু ও ঘুঘু—বৈতল ; শৈবাল ও প্রবালকুমার গুপ্ত—নূতনচটী।

পুরুলিয়া—অশোকা—মানপুর ; দিদু, কাকীমা, ছোটপিসি, রবি ও বুলু—রঘুনাথপুর ; দিলীপকুমার চৌধুরী—মধুপুর ; বাবা, মা, বড়ন, ছোটন, ছোড়দি, দাদা ও শান্তনু—রঘুনাথপুর ; রামেশ্বর, গোবিন্দ, জগৎবল্লভ, সতীশচন্দ্র ও অমলেন্দু—মানপুর ; খুকু, রুমা, বুনি, তনু, বাপী ও মিণ্টু—মধুতটী ; খোকন, ষষ্ঠী, বেবী, দোলন, তোতন ও সুকান্ত—মধুতটী ; মধুতটী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ—মধুতটী ; কাজল, কবিতা, কণিকা, কল্যাণ, কল্লোল প্রভৃতি—আদ্রা ; অজিত, রঘু, শিশির, অসিত, রাম ও মিলন—রাজার বেড়।

বীরভূম—বাবা, গায়ত্রী ও দেবাশীষ প্রামাণিক—সিউড়ী ; শ্রীলেখা উষ্ণীষ, কেয়া ও রণদীপ ঘোষরায়—মুরারই ; বিকাশকুমার ভট্টাচার্য—নলহাটী ; বাবা, মা, সুমন্ত্র, কৌশিক ও শ্রবণা চক্রবর্তী—শান্তিনিকেতন ; রূপঙ্কর, অনুরাধা ও রুবী—বোলপুর ; সুপ্রিয়া, সুদেষ্ণা, সুকৃতি ও কমলপ্রিয়া বিশ্বাস—শান্তিনিকেতন।

দার্জিলিং—বাবা, মা, তনুশ্রী, শচীদুলাল, অনুশ্রী ও দেবদুলাল মজুমদার—শিলিগুড়ি জংশন ; স্বগতা, ঈশিতা, সুবীর ও শর্মিলা—শিলিগুড়ি ; সুশান্ত, সুমন্ত, সুকান্ত, সুনন্দ, শুভাশীষ ও দেবাশীষ চক্রবর্তী—শিলিগুড়ি ; টুকটুক, কুমকুম, বাবা ও মা—শিলিগুড়ি ; রবীন্দ্র, রাণীমা, মা, বাচ্চু ও স্বাতী—শিলিগুড়ি।

জলপাইগুড়ি—অশোক, মুনমুন, দীপালি ও আলোরাণী—মোরাঘাট চা বাগান।

বিহার—রমেশদা, টুনু ও বন্দনা—মৌভাণ্ডার ; গোপাল, গৌতম, মনু, মালা ও পুলক সেনগুপ্ত—বার্মামাইনস্ ; সাধন, বিশু, পরেশ ও অম্বিকা—চিরকুণ্ডা ; অসীমকাল ও অরুণআলো রায়—মাইথন ড্যাম ; দীপক, মালবিকা, ঠাকুমা ও শেফালিকা—হিন্দপিড়ি ; চিরঞ্জীব, মেজদা, মহাধন, কৃষ্ণমূর্তি, গৌতম প্রভৃতি—কুসুণ্ডা ; মালা, মিলি, পতু, রত্না, পপ্পু ও তমু—খাস ঝরিয়া কলিয়ারী ; কুমকুম, ছন্দা, তপতী, মা, বড়দি, ছোড়দি ও আরো অনেকে—ডোরেণ্ডা ; বৈদ্যনাথ, অমরেন্দ্র ও মদন-মোহন—উধুয়া ; অনিতা, মালা, বন্দনা, অর্চনা, সান্ত্বনা, অনুশ্রী প্রভৃতি—ঝরিয়া ; বাচ্চু, কপি, অসিত, বাবা ও মা—ঘাটশীলা ; সোমা, রমা, কাচ্চি, বাচ্চি, বাচ্চু প্রভৃতি—চক্রধরপুর ; বাপি, মামণি, দিদি-ভাই, মেজদি, সেজদি প্রভৃতি—চক্রধরপুর ; সাধনা, টুনু, বুড়ু ও পুটু—মৌভাণ্ডার ; মা, সুবা, গৌতম, ছোটকা ও শচীন চক্রবর্তী—খাস ঝরিয়া কলিয়ারী ; দীপুদা, নির্মাল্য, পঙ্কজ ও অমিত রায়—জামসেদপুর-৫ ; মলয়, নীহার, সুকুমার, মলিন, রিঙ্কু ও সুখেন—মহুদা ; শ্রীপর্ণা, রুণা, মঞ্জুষা, অঞ্জনা, অজন্তা প্রভৃতি—কদমা ; উষা, প্রদীপ ও দিলীপ ব্যানার্জী—এগ্রিকো ; বাণী, কবিতা, অনুপ ও অঞ্জয়

মুখার্জী—টাটানগর ; সুকুমার, সুভাষ, স্বপ্না, রত্না, অঙ্গনা প্রভৃতি—জামসেদপুর-৮ ; বাবা, মা, দাদা, বৌদি, বাবলু, দিলীপ, মালা প্রভৃতি—ঝরিয়া ; দিলু, দেবু, স্বপন, বাবলু, বেবী ও কিশোরীদা—নওয়াগড় ; মৃগেন্দ্রনাথ মুখার্জী—মহুদা ; মা, বাবা, শিবাংশু, শৌভিক এবং শমিতা—জামসেদপুর ; চিন্ময়, মা, বাবা, সুভাষ, বাপন, শুক্লা ও স্বপন—আমলাপাড়া ; সাধন, নিখিল, পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়—নয়াবাদ ; বাবা, মা, দাদা, দিদি, জামাইবাবু, টিংকু ও সুব্রত সেন—নয়াবাদ ; বিভাস ও কমল ভট্টাচার্য —মাইথন ; অমিত, অনুপ, অনিতা, মা ও বাপী—জামসেদপুর ; উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু—২২৮৫৬ ; বাবা, মা, চিত্রা, মঞ্জু ও অরুণ—পূর্ণিয়া ; কার্তিক, জগন্নাথ, শেফালী, অঞ্জলি ও জামাইবাবু—মজঃফরপুর ; এনাক্ষী, মীনাক্ষী ও বিশ্বদীপ ঘোষ—চাইবাসা ; বাবা, মা, তাতা, টোটন, বুবু, টুলু প্রভৃতি—কদমা ; ভাস্কর ভট্টাচার্য—ভাগলপুর-১ ; মিহির, সুবীর, নীলিমা ও প্রবীরকুমার ভট্টাচার্য—টেলকো কলোনী ; টুকু, খুকু ও অভিজিৎ—গিড়্ডি কলিয়ারী ; গৌরীপ্রসাদ, বঙ্কিমচন্দ্র ও গোবিন্দকুমার ভকত—কালিকাপুর ; দ্বারিকানাথ, জয়ন্ত, কেশব, বর্ষারাণী ও ঝর্ণারাণী—কালিকাপুর ; মা, বাবা, অমিতাভ, পূর্ণিমা ও মধুছন্দা—টেলকো ; মধুমিতা সরকার—গিত্ডি কলিয়ারী ; দীপন সঙ্ঘের ভাইবোনেরা—ফার্ম এরিয়া ; তপন, মৌসুমি, মা, কাকু, কাকিমা প্রভৃতি—রাঁচী ; মঞ্জু, বীথু, লিণ্টু, মিঠু, গবু, বাবা ও সেজকাকু—রাঁচী ; চিন্ময়, চয়ন, দিলীপ, তপন ও তাপস—ঝরিয়া ; শান্তা, রীতা, রাণ্টু, মিতা, কানু, চন্দন প্রভৃতি—জামতাড়া ; বাবা, মা, সুদীপ্ত, প্রদীপ্ত, নন্দিতা ও সঞ্চিতা—বেতিয়া ; হিমাংশু, সুধাংশু, দেবাংশু ও শীতাংশু—কাতরাসগড় ; সুমন্ত, দেবাশীষ ও মাস্টারমশাই—খাস গোবিন্দপুর কলিয়ারী ; মঞ্জু, অঞ্জলি, কাবেরী, অদিতি ও পাপিয়া চক্রবর্তী—কাতরাসগড় ; দাদু, দ্বিজু, দ্বিপু, নিপু, রাজু, বিজু, মনু ও কনু—বিষ্ণুপুর ; বুবলু, টুবলু, টিকলু, কিটি, মিঠি ও পিকলু—জামসেদপুর।

উড়িষ্যা—শিখা, রীতা, সব্যসাচী ও মিতা—রাউরকেল্লা ; কুণাল, শুভঙ্কর ও কঙ্কর ভট্টাচার্য—রাউরকেল্লা ; অপু, অরু ও চৈতি—উমরকোট।

আসাম—সুতপা, মীনাক্ষী, উমা ও রূপা চক্রবর্তী—ডিব্রুগড় ; বুলবুল, বন্দনা, আলপনা, সুরজিত ও আশিস ভট্টাচার্য—মালিগাঁও ; ভুটু, মিঠু, খুকু, তিতু, বাবা, মা—মালিগাঁও ; অমল, অরুণ, উদয়, রিক্তা, মুক্তা ইত্যাদি—গৌহাটি ; বাবা, মা, সমীরা, অমল, বেবী ইত্যাদি—বড়পাথার ; ঝুমা, মিনু, রেবা, খুকু ও দুলাল চক্রবর্তী—ডিব্রুগড় ; চন্দন, ছানু, পিনু, মীরা, শিখা ইত্যাদি—করিমগঞ্জ ; বৌদি, হাসি, শিপ্রা ও রীণা সেন—করিমগঞ্জ ; বুড়ু, বাবু, ধুলা, ধ্রুব, টুটুল ও তাপসী—শিলং-১। পাতু, আহু, চাঁদু ও সাতু—পাণ্ডু ; তাপস, মুন্না, রঘু ও ছোটন—জোড়হাট ; গৌতম, অনিমেষ ও বিভাস—করিমগঞ্জ ; শেলী, লিলি, রীণা, টুকুন ও মুকুল—হাফলং ; মাদু, চম্পা, ছোড়দি, বাবা, রাঙ্গামাসী ও মেজদা—শিলচর ; বেবি, মলিন ও বাবু—ডুমডুমা ; মা, বাবা, বড়দা, মেজদা, সেজদা, দীপক ইত্যাদি—জালালপুর চা বাগান ; দেবযানী, ভবানী, শিবানী, সুদীপ, সুব্রত ইত্যাদি—ডিগবয় ; দিলীপ, দিপালী, নিলীমা, অশোক ও রত্না—চিকনমাটি ; স্বপ্না, রানা, রত্না ও রীণা নাহা—নূনমাটি ; শিখা, বিনায়ক ও উর্মি চক্রবর্তী—গৌরীপুর ; কবিতা, রেবা, সবিতা, হরিপদ ও নরেশ—রাঙ্গাপাড়া ; সন্তু, শেখর, মালবিকা ও নারু দত্ত——করিমগঞ্জ ;

উত্তরপ্রদেশ—সুবোধ ও বিউটি মুখার্জী—বারাণসী ; ভুঁদু, বুলবুল, দীপক ও কানুদা—বারাণসী ; ধ্রুব, ছোটু, তারা, কেদার, মধু ইত্যাদি—সোনারপুরা ; পম্পা, পাপড়ী, জুজু, দিদিভাই, দিদা ও মা—বারাণসী ; রূপা, শংকর, রুমি, মা ও বাবা—এলাহাবাদ ; কল্যাণ, রবি ও দ্বিজেন চৌধুরী—বারাণসী।

মধ্যপ্রদেশ—মা, দিদিমা, সুবীর, জ্যোতি, দীপ্তি ইত্যাদি—গ্যাড়োল।

নিউদিল্লী—পার্শ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়—হজ্খাস ; স্বাতী, রীতা, রত্না, বাবা ও মা—লক্ষ্মীবাঈনগর।

মহারাষ্ট্র—সুগত ও সুপর্ণা দেব—থানা।

অন্ধ্রপ্রদেশ—মালবিকা, মণিদীপা, দেবপ্রতিম ও দীপশিখা—বিশাখাপত্তনম-৪।

মাদ্রাজ—বাপী, মামণি, নমিতা, ব্রতীন ও পূর্ণা—মাদ্রাজ—১০।

(বাকি উত্তরদাতাদের নাম কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।)

মাঠে ময়দানে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কি বিশ্রী সব কাণ্ড!

বিল্টু-মন্টুদের দুঃখ দেখে কে। কোন মানে হয় এইভাবে হেরে যাবার। বিল্টু-মন্টুদের সঙ্গে ঘোৎনা, ভণ্টে, সন্তু এবার সকলে একদলে। ওরা ঠিক করেছে যে এবার সবাই মিলে ভারতের খেলোয়াড়দের দুয়ো দেবে। আহা, কি খেলাই না খেলেছেন বাবুরা!

যে থাইল্যাণ্ড সবার কাছে হারছিলো কিংবা ড্র করছিলো সেই থাইল্যাণ্ডের কাছেই কিনা ভারত হেরে বসলো। এর কি কোন মানে হয়। অথচ ঠিক তার আগের খেলায় গত বছরের যুগ্ম বিজয়ী বর্মাকে ভারত হারিয়ে দিয়েছিলো। তাই শুধু বিল্টু-মন্টুরাই নয় আমরা সবাই আর ওদেশের সকলেই আশা করেছিলেন যে ভারত সেমি-ফাইন্যালে উঠবেই। কিন্তু সকলের সে আশার মুখে ছাই দিলো থাইল্যাণ্ড।, তারাই কিনা এক গোলে হারিয়ে দিলো ভারতকে।

ওরা সেদিন স্কুলে বসে খবরের কাগজে খবরটা পড়েছে আর হেসেছে আর মনে মনে বলেছে, ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে। ও ধরনের ঘটনা কলকাতার ময়দানে হামেশাই ঘটে। কিন্তু তাই বলে যে কুয়ালালামপুরের মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত হেরেছে বলে ভারতীয় সমর্থকরা অমন ক্ষেপে উঠবে—এইটাই বা কে আশা করেছিলেন।

এদিকে কলকাতা ময়দানও তো আবার জমে উঠবে-উঠবে করছে। আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা আরম্ভ হলো। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই তো মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং মাঠে নামবে শীল্ডের খেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে। কলকাতার বাইরের দলগুলো অবশ্য তার অনেক আগেই মাঠে নামবে।

শীল্ডের খেলা তো আরম্ভ হয়ে গেলো কিন্তু এবারের লীগ ফুটবলের পালা তো এখনো চুকলো না। সিঙ্গল লীগের খেলা অবশ্য শেষ হয়ে গেছে। সিঙ্গল লীগের পয়েণ্টের হিসেবে মোহনবাগানই আছে সবার ওপরে। তারপর ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং আর এরিয়ান্সের স্থান। এবছরের লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের সম্মান লাভ করার জন্যে এই চারটি দলকে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে সুপার লীগের আসরে। দেখা যাক এবারের এই অদ্ভুত চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত কোন্ দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়।

বিল্টু-মন্টুরা এখন আর মোটে সময় পায় না। কাঁহাতক আর সেজদাদুর চোখ এড়িয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসে থাকা যায়। কিন্তু খবরের কাগজের খেলার পাতাগুলো এখন খবরে ঠাসাঠাসি। অলিম্পিক আসছে তার খবর, ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার অ্যাসেজ লড়াই শেষ হচ্ছে তার খবর, তা ছাড়া লীগ আর শীল্ডের খবর তো আছই।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়া যে এবারও অ্যাসেজ লাভ করবে—এ কথা ওরা কেউ ভাবতেই পারে নি। পারবেই বা কি করে? কাউড্রের নেতৃত্বে যে দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে দিয়ে আসতে পারে তারা কি করে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে পারে! ইংলণ্ড অবশ্য হেরেছিলো একমাত্র প্রথম টেস্টেই। তার পরের তিনটে টেস্ট পর পর শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। এখন চলেছে পঞ্চম টেস্টের খেলা। এই টেস্টে যদি ইংলণ্ড জেতে তাহলেও অ্যাসেজ থেকে যাবে অস্ট্রেলিয়ার হাতে। কারণ এবারের মরসুম অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও পূর্ব জয়লাভের সূত্র ধরে অ্যাসেজ থাকছে অস্ট্রেলিয়ার দখলেই।

তবে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার লড়াই নিয়ে এখন আর কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। সবার চোখ এখন মেক্সিকো অলিম্পিকের দিকে। মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল এবার কি করে সেইটাই দেখার বিষয়। পৃথ্বিপাল সিং এবার হয়েছেন ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক। আর বাংলার গুরুবক্স সিং দলের যুগ্ম অধিনায়ক। দুজনেই আশা করছেন যে মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারত স্বর্ণপদক লাভ করবেই। ওদের আশা আছে শুনলেই আমাদের ভরসা চলে যায়। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়!

A Novel Way of
Spoken English

by **D. K. Roy, M. A.**

বাংলার মাধ্যমে ইংরেজীতে কথাবার্তা শিখিবার অভিনব গ্রন্থ। ছাত্রদের কথোপকথনের (Dialogues) বিষয় সাহায্য করিবার জন্য কিছু কিছু প্রয়োজনীয় Dialogues দেওয়া হইয়াছে। ইহা শিক্ষার্থী, ছাত্র, চাকুরীয়া, সাধারণ গৃহস্থ সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়।

মজবুত বোর্ড বাইণ্ডিং মূল্য মাত্র ৩·৫০ পঃ।

ভি. পি.তে ৪৲ টাকা মাত্র।

সকলপ্রকার যন্ত্রবিদ্যাবিষয়ক (Technical and Engineering) ও চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত (Medical Books) উপযুক্ত কমিশনে বিক্রয় করা হয়। ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।

Bengal Book Agency
Agents & Book-sellers
1 Shyama Charan Dey Street,
Calcutta-12

সবেমাত্র প্রকাশিত হ'ল

উপহারের ও লাইব্রেরীর উপযোগী বই

ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী ●

শাশ্বত ভারত ঃ

উপদেবতার কথা

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এতে আছে কিন্নর, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ ইত্যাদির কথা— মূল্য ৬·০০

এই পর্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত বইগুলি প্রকাশ করেছি ঃ

দেবতার কথা ঋষির কথা

অসুরের কথা

ছোটদের জন্য ভ্রমণকাহিনী

আমাদের দেশ

উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও মহিসুর

প্রতি খণ্ড ২·৫০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী প্রণীত

পুণ্য জীবনকাহিনী ও অলৌকিক লীলামাহাত্ম্য

পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা ১০·০০

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা

শতাব্দীর সূর্য ৫·০০

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

ছোটদের উপহার দিতে একখানি চমৎকার গল্প-সংকলন

কুলদা-কিশোর-গল্পচতুষ্টয় ১০·০০

শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক কুলদারঞ্জন রায় প্রণীত **পুরাণের গল্প, কথাসরিৎসাগর, বেতাল-পঞ্চবিংশতি** ও **রবিন হুড** এই চারটি গল্পের সমন্বয়ে গ্রথিত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এবার পূজোয়

নতুন বেরুলো

শিব্রাম THE ভূপর্যটক— ২·৫০

শিবরাম চক্রবর্তী

কুমারেশ ঘোষের হাসির গল্প— ২·৫০

কুমারেশ ঘোষ

উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্প— ২·৫০

ডঃ শুকদেব সিংহ

কথা সরিৎসাগরের গল্প— ৩·০০

তারাপদ রাহা

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং

১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

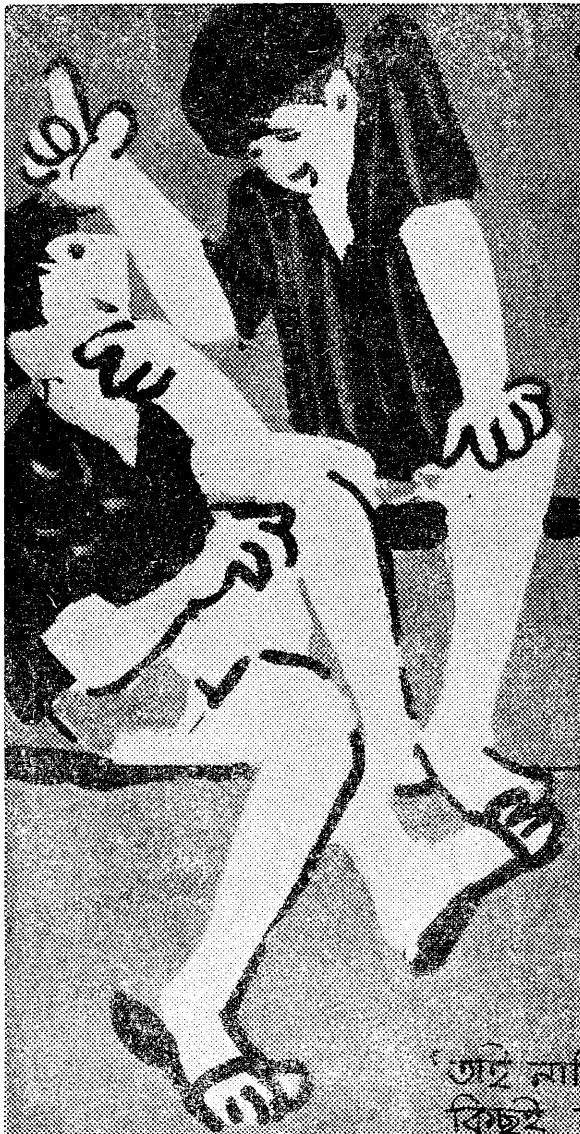

'জানিস, এবার পুজোয়
আমাদের পাড়ায়
বোরোলীনের সেট
আসছে!'
'বোরোলীন আবার
কি রে?'
'দূর বোকা, বোরোলীন
জানিস না — পুজোয়
সবাই বোরোলীন
কিনবে — বোরোলীন
মাখলে গায়ের চামড়া
নরম হয়, চামড়ার
সব দোষ নষ্ট হয়।
আর কখনও যদি
কেটে যায়, তখন
বোরোলীন একটু-
খানি লাগিয়ে দিলে
ঘা শিগগিরই সেরে
যায়।'
'তাই নাকি? আমি ত' এসব
কিছুই জানতুম না। তাহলে
আমিও এবার
বোরোলীন কিনব'
বোরোলীন হাউস,
কলিকাতা-৩

শক্তিতে ভরপুর, আলো খুব জোরদার—
হবেই তা 'এভারেডী', আঁধারের হাতিয়ার!

UC 4349

কিভাবে সাহায্য দেওয়া হয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে

পি এন বি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। নতুন নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এবং স্থাপিত কারখানার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য পি এন বি অগ্রীম অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। তাছাড়া শিল্প ও ব্যবসা সম্বন্ধে বিনামূল্যে পরামর্শ ও দেওয়া হয়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পি এন বি-র নিকটস্থ শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সারা ভারতে আমাদের ৫০০ টিরও অধিক শাখা আছে।

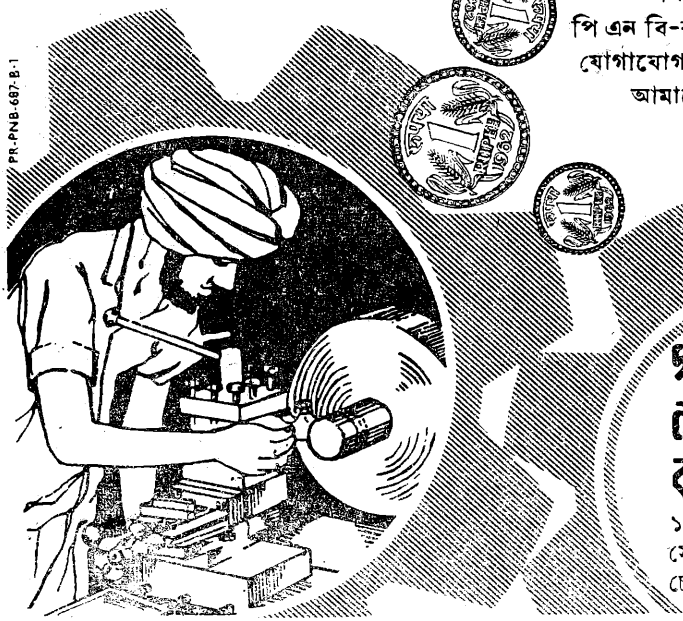

PR-PNB-687-B-1

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

চেয়ারম্যান: এস. সি. ত্রিখা